ফুলকি ও ফুল

বর্তমান ভারত ও পাকিস্তানের বিখ্যাত উর্দু কথা-শিল্পীদের মধ্যে কৃষণ চন্দর অন্যতম। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে। ইতিপূর্বে তাঁর 'অন্নদাতা' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় 'ফুলকি ও ফুল' তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। কৃষণ চন্দরের অন্যান্য বইও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হবে।

ফুলকি ও ফুল

রচনা :

কৃষণ চন্দর

অনুবাদ : পার্থকুমার রায়

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ১৯৫২

দাম : এক টাকা বার আনা

প্রকাশক : বিমল মিত্র, র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
মুদ্রাকর : করুণা বিশ্বাস, পিপ্‌লস্‌ প্রিণ্টিং সার্ভিস, ১৩ ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা

পেশোয়ার এক্সপ্রেস

পেশোয়ার স্টেসন ছাড়বার পর আমি স্বস্তির ধূম্র-নিশ্বাস ফেলে হাঁফ ছাড়লাম। আমার গাড়িতে যারা যাচ্ছে তারা প্রায় সকলেই হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তু। তারা এসেছে পেশোয়ার, হতিমর্দান, কোহাট, চারসরা, খাইবার, লাণ্ডি কোটাল, বান্নু, নওসেরা, মানসেরা থেকে, সীমান্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে। অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রেখে নিপুণভাবে স্টেসন পাহারা দিচ্ছে মিলিটারী অফিসাররা। কিন্তু উদ্বাস্তুরা কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না যে পর্যন্ত না আমি বিচিত্র পঞ্চনদীর দেশের দিকে ধাবমান হওয়ার জন্য পদ-চক্র চালিয়েছি। অন্যান্য পাঠানদের থেকে কিন্তু এই উদ্বাস্তুদের কোনরকমেই আলাদা ক'রে দেখতে পারবে না তুমি। বেশ লম্বা চওড়া সুন্দর শক্ত-সমর্থ লোকগুলো, পড়নে তাদের কুল্লা, লুঙ্গী, সালোয়ার, কথনে রূঢ় পুস্তো ভাষা। প্রত্যেকটি গাড়ির সামনে দু'জন ক'রে সদা-প্রস্তুত বেলুচি সৈন্য দাঁড়িয়ে। হাতে রাইফেল, মুখে হিন্দু পাঠানদের প্রতি, তাদের জেনানা ও শিশুদের প্রতি মৃদু হাসি। হাজার হাজার বছর ধরে পুরুষানুক্রমে এখানে বাস ক'রে আজ এই লোকগুলো নিজভূমি ছেড়ে পালিয়ে চলেছে কোন অজানা স্থানের উদ্দেশ্যে। এই পাহাড়ী কঙ্কর-ভূমির আবেষ্টনেই তাহারা শক্তিমান হয়ে উঠেছে, ঐ তুষার

বিগলিত ঝর্ণা ধারায় তারা মিটিয়েছে তাদের তৃষ্ণা, সূর্যকরোম্নাত দ্রাক্ষাকুঞ্জের সুমিষ্ট আঙুর ফলের রস তাদের জীবনসত্বার সঙ্গে রয়েছে মিশে। হঠাৎ আজ তাদের জন্মভূমি, তাদের স্বদেশ পরভূমে পরিণত হয়ে গেল, আজ তারা উদ্বাস্তু। অনিচ্ছা সত্বেও আজ দুর্ভাগ্য-তাড়িত হয়ে পালিয়ে চলেছে তারা কোন্ গ্রীষ্মপ্রধান নূতন দেশের উদ্দেশ্যে। ভগবানের অসীম দয়া, তবুও তো তারা আজ প্রাণে বেঁচে কিছু সম্পত্তি হাতে নিয়ে, মেয়েদের সম্মান বাঁচিয়ে চলে আসতে পেরেছে। তাদের হৃদয় দুঃখে বেদনায় ক্রোধে ভেঙ্গে পড়ছে। কঙ্কর-ভূমির প্রস্তর-প্রাণ ভেদ ক'রে তাদের নালিশ, তাদের জিজ্ঞাসা যেন মূর্ত হয়ে উঠছে তাদের প্রতিটি দীর্ঘনিশ্বাস, তাদের চাহনির ভেতর দিয়ে : 'মাগো, কেন আজ তোমার সন্তানদের দূর ক'রে দিলে, কেন তোমার মেয়েদের বুক থেকে সড়িয়ে দিলে। দ্রাক্ষাকুঞ্জের মত তোমার বুকে তোমার সরলা মেয়েরা বেড়ে উঠেছে, আজ কেন তাদের দূর ক'রে দিচ্ছ মা?'

আমি ছুটে চলেছি উপত্যকা ভূমির উপর দিয়ে। আমার গাড়িগুলোর অভ্যন্তরে বেদনামাখা দৃষ্টি ফেলে ছুটে চলেছে উদ্বাস্তুর কাফিলা। প্রতি মুহূর্তের পেছনে-ফেলে-আসা মালভূমি, নিম্নভূমি, গিরিসঙ্কট, আঁকা-বাঁকা নদীর ওপরে অশ্রু-মাখা দৃষ্টি বুলিয়ে বেদনাহত হৃদয়ে তারা যেন বিদায় নিচ্ছে চিরদিনের মত। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটি জিনিস, দৃষ্টিপথে যা কিছু এসে পড়ছে, তার প্রত্যেকটি এবং সমগ্রভাবে সব কিছু যেন তারা সংগ্রহ ক'রে অতি সযত্নে হৃদিমাঝে লুকিয়ে নিয়ে চলেছে কোন্ সুদূর দেশে; এবং আমারও ব্যাথায় বেদনায় লজ্জায় সমস্ত দেহ ও পদচক্র এত

ভারী মনে হচ্ছে যে আমি আর দৌড়তে পারছি না, বোধ হয় আম আর দৌড়তে পারব না।

এসে দাঁড়ালাম হাসান আবদাল স্টেসনে। আরও উদ্বাস্তুর ভিড়। পাঞ্জা সাহেব থেকে আগত শিখ উদ্বাস্তু তারা। লম্বা কিরপান ঝুলছে তাদের কোমরে, ভয়ে ত্রাসে মুখ বিবর্ণ। অজানা শঙ্কায় তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো বড় বড় চোখ মেলে চারদিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে দেখে হাঁফ ছেড়ে তারা প্রবেশ করল আমার গাড়ির অভ্যন্তরে।··· উদ্বাস্তুদের এই যে লোকটিকে দেখছ, ওর বাড়ি-ঘর সব গেছে; কোণের ঐ লোকটি সব কিছু ফেলে পালিয়ে এসেছে, কিচ্ছু আনতে পারে নি, শুধু পরনের কামিজ সালোয়ার ছাড়া; ঐ লোকটি জুতো জোড়া ফেলে চলে এসেছে; ঐ কোণের লোকটিকে দেখছ, ও কিন্তু সত্যিই ভাগ্যবান, ও সব কিছু নিয়ে আসতে পেরেছে, মায় ভাঙ্গা খাটিয়াটা পর্যন্ত! কোণের ঐ সর্বস্বান্ত বিবর্ণ উদ্বাস্তুটির মুখ যেন কে সেলাই ক'রে দিয়েছে, চুপচাপ একাকী বসে আছে সে। এই যে লোকটিকে দেখছ, কথায় কথায় যে কেবল লাখ বেলাখের খৈ ফুটিয়ে চলেছে আর মুসলমানদের গালাগাল করছে, এর জীবনে কিন্তু একটি পয়সাও ছিল না কোন দিন। দ্বারের পাশে পাহারাদার বেলুচি সৈন্যরা নীরবে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে তাদের মৃদু হাসি।

তক্ষশিলায় আমাকে দাঁড়াতে হ'ল অনেকক্ষণ। গাড়ি ছাড়বার জন্ত আমার গার্ড স্টেসন মাষ্টারকে বলতেই তিনি বললেন, আশেপাশের গাঁ থেকে হিন্দু উদ্বাস্তুর কাফিলা আসছে, তারাও এই গাড়িতে যাবে। এক

ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। গাড়ির অভ্যন্তরের যে-সব উদ্বাস্তরা গ্রাম ছেড়ে পালাবার সময় কিছু খাবার এনেছিল সঙ্গে, তারা পোঁটলা খুলে খেতে বসল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শঙ্কাজড়িত মুখে আবার হাসি ফুটল, যুবতী, কিশোরী কন্যারা লজ্জা বিনম্র আঁখি তুলে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। বৃদ্ধরা হুঁকো মুখে দিয়ে আবার বুরুক বুরুক শব্দে তামাক টানতে আরম্ভ করল। হঠাৎ এমন সময় বহু দূর থেকে ঢোলের কড় কড় শব্দ কানে এসে লাগল। হিন্দু উদ্বাস্তদের একটি জাঠা আসছে এদিকে। আরও কাছে এলে চিৎকার শোনা যায়। আরও কিছুক্ষণ সময় কেটে যায়···মনে হয় স্টেসনের কাছাকাছি বোধ হয় এসে গেছে। জয় ঢাকের বাজনা যেন বড় বেশী ক'রে বাজছে···হঠাৎ এক পশলা গুলি বর্ষণের শব্দ আসে কানে। সন্ত্রস্ত কিশোরী যুবতীরা তাড়াতাড়ি জানালা নামিয়ে দিয়ে আমার অভ্যন্তরের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ে। আশেপাশের গাঁয়ের মুসলমান প্রতিবেশীর রক্ষণায় হিন্দু উদ্বাস্তর একটি জাঠা সত্যিই এসেছে। এক একজন মুসলমানের কাঁধে রয়েছে এক একটি কাফেরের মৃতদেহ, গ্রাম ছেড়ে যারা পালাতে নিয়েছিল তাদের···দুশোটি মৃতদেহ···অতি সযত্নে বহন ক'রে আনা হয়েছে। মৃতদেহগুলি বেলুচি সৈন্যদের হাতে তুলে দিয়ে মুসলিম জনতা দাবী করে যে এই সব হিন্দু উদ্বাস্তর মৃতদেহগুলি সযত্নে সম্মানের সাথে হিন্দুস্থানের দরজায় পৌঁছে দিতে হবে। এই মহান দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়ে বেলুচি সৈন্যরা প্রত্যেকটি গাড়ির মাঝখানে কয়েকটি ক'রে মৃতদেহ শুইয়ে দেয়। তারপর সেই জনতা আকাশের দিকে আর এক পশলা গুলি বর্ষণ ক'রে স্টেসন

মাস্টারকে হুকুম করে গাড়ি ছাড়বার। মাত্র কয়েক পদচক্র আমি এগিয়েছি, এমন সময় কে যেন শিকল টেনে আবার আমার গতিরোধ করল। আশেপাশের গ্রামগুলোর মুসলিম জনতার জমিদার নেতা এগিয়ে এসে একটি কামরার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, দু'শোজন জন হিন্দু তাদের গ্রাম ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে চলে গেল, তাদের গ্রামের এ-ক্ষতি পূরণ তো করা হয় নি। সে-ক্ষতি পূরণ করতেই হবে। সুতরাং এই ট্রেন থেকে দু'শো জন হিন্দু ও শিখকে নামিয়ে নিতে হবে। তাদের দেশের মানুষের সংখ্যাল্পতা তো পূরিয়ে নিতেই হবে। নেতার দেশাত্ববোধর তারিফ করলো বেলুচি সৈন্যরা, ট্রেনের বিভিন্ন কামরা থেকে দু'শো জন উদ্বাস্তুকে তুলে জনতার হাতে দিল তারা।

জমিদার নেতা চিৎকার ক'রে হুকুম করলো,

'এই কাফেররা, লাইন দিয়ে দাঁড়া।'

ভয়ে ত্রাসে লোকগুলো যেন কাঠ হয়ে গেছে। মৃত্যুর হিম শীতল স্পর্শ লেগেছে যেন তাদের গায়ে। জনতার লোকেরা এদের ধরে ধরে কোনমতে খাড়া ক'রে দেয় এক লাইনে। দু'শোটি জীবন্ত মৃতদেহ··· ত্রাসে ভয়ে তাদের বিবর্ণ মুখে নিলাভার ছাপ পড়েছে···তাদের চোখের মণিতে যেন ধাক্কা লাগছে রক্তপিপাসুদের শরাঘাত···

বেলুচি সৈন্যরাই সুরু করে···

পনর জন উদ্বাস্তু থর থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে শেষ নিশ্বাস ফেলে পড়ে যায়···

তক্ষশিলা।

আরও কুড়িজন লুটিয়ে পড়ল···

এশিয়ার সর্ববৃহৎ বিশ্ববিত্তালয় অবস্থিত ছিল এই তক্ষশিলায়। হাজার বছর ধরে কত অগুন্তি ছাত্র মানব-সভ্যতার প্রথম পাঠ শিখেছিল এই বিত্তাপীঠস্থানে।

আরও পঞ্চাশ জন পড়ে গেল···

তক্ষশিলার যাত্নঘরে সংগৃহীত রয়েছে কি সুন্দর সুঠাম মর্মর মূর্তি—শিল্পচাতুর্যের কি অদ্ভুত অতুলনীয় অলঙ্কার···অপূর্ব দুর্লভ ভাস্কর্যের কি অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প-নমুনা—আমাদের মহান সভ্যতার প্রজ্বলিত প্রদীপ···যে ঐতিহ্যের আলোকে আমরা গর্বিত।

আরও পঞ্চাশ জনের এই পৃথিবীর মায়া কেটে গেল···

এরই পিছনে ছিল সিরকপের প্রাসাদ···ক্রোস ব্যাপী বিরাট ক্রিড়া-উত্তান···একটি সুপ্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ।

আরও তিরিশ জন···

কনিষ্কের রাজধানী ছিল এখানেই। জনসাধারণকে তিনি দিয়েছিলেন শান্তি, সমৃদ্ধি ও ভ্রাতৃত্ববোধ।

আরও কুড়িজন···

আশেপাশের এই সব গ্রামেই বুদ্ধের বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছিল···সত্যম সুন্দরম ও মানবপ্রীতির নতুন জীবন-পথের সন্ধান দিয়েছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা।

তুশোটি মানুষের শেষ কয়েকটি জীব মহাপ্রয়াণের প্রতিক্ষায় পল গোণে···

এখানেই দিগন্তে সর্বপ্রথম হেসে উঠেছিল ইসলামের অর্ধচন্দ্র, বহন ক'রে এনেছিল সমতা, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতার মহাবাণী।

প্রতীক্ষমান বাকী মানব জীবগুলির জীবন অস্ত হয়ে গেল…

আল্লাহো আকবর! আল্লা তুমিই মহান!

রক্তস্নাত রেল-প্লাটফরম ছেড়ে অবশেষে আমি রওনা হলাম। আমার পদচক্রের প্রতি আবর্তনে আমি যেন অনুভব করছি যে আমার চাকা আর চলছে না, পিছলে যাচ্ছে।

ট্রেনের প্রতিটি কামরায় মৃত্যু নেমে এসেছে। গাড়ির মাঝে শায়িত মৃতদেহকে ঘিরে বসে আছে জীবন্ত মৃতদেহগুলি। একটি শিশু কেঁদে ওঠে ··একটি স্ত্রীকণ্ঠের চাপা কান্না কানে ভেসে আসে···ওখানে মৃত স্বামীর ক্ষত বিক্ষত দেহ জড়িয়ে স্ত্রী পড়ে আছে···। আমি ছুটে চলেছি, ভয়ের ত্রাসের তুহিন-শীতল মনে ছুটে চলেছি। এসে দাঁড়ালাম রাওলপিণ্ডি স্টেসনে।

এখানে কোন উদ্বাস্তুই আমার প্রতীক্ষায় নেই। শুধু জন কয়েক মুসলিম যুবক প্রায় জন কুড়ি বোরখা-পরা মেয়েদের নিয়ে একটি কামরায় উঠলো। হাতে তাদের রাইফেল এবং সঙ্গে কয়েক বাক্স গোলাগুলি। ঝেলাম ও গুজরখানের মাঝে শিকল টেনে আমাকে তারা থামিয়ে নিচে নামল। বোরখা-আবৃত মেয়েরা হঠাৎ বোরখা খুলে ফেলে চিৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে:

'আমরা হিন্দু, আমরা শিখ, আমাদের জোর ক'রে এরা নিয়ে এসেছে।'

অট্টহাসিতে যুবকরা ফেটে পড়ে :

'হাঁ, আমরা এদের শান্তির নীড় ভেঙ্গে টেনে নিয়ে এসেছি···আমাদের লুটের মাল, যা' খুসী তাই করব! দেখি কার কত হিম্মত আছে প্রতিবাদ করার?'

দু'জন হিন্দু পাঠান কামরা থেকে লাফ দিয়ে পড়ল তাদের রক্ষার জন্য। নীরব বেলুচি সৈন্যরা শান্তভাবে তাদের খতম ক'রে দিল। আরও কয়েক-জন লাফ দিয়ে বের হল এবং এই ভাবেই তারাও প্রাণ দিল। তারপর সেই যুবকেরা লাইনের পাশের জঙ্গলে যুবতী কন্যাদের জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেল···। লজ্জায় কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঊর্ধ্বশ্বাসে আমি ছুটলাম। যাক্, ফেটে যাক আমার বুকের লৌহ ফুসফুস···আমারই চোখের ওপরে যে-লজ্জা অপমান ঘটে গেল, যে-দুঃখের নীরব সাক্ষি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এই গহন অরণ্য, তাকে পুড়িয়ে খাক ক'রে দিক আমার মনের জ্বালার প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা।

লালা মুসার দিকে আমি ছুটেছি। কামরার অভ্যন্তরের মৃত দেহগুলি থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। বেলুচি সৈন্যরা ঠিক করল ওগুলোকে ধাবমান গাড়ির বাইরে ফেলে দেবে। কিন্তু কি ক'রে ফেলা যায়? হঠাৎ বুদ্ধি খেলে গেল তাদের মাথায়। উদ্বাস্তুদের যে লোকগুলো তাদের পছন্দ হয় না, তাদের হুকুম করে এক একটা গলিত লাস গাড়ির দরজায় টেনে আনতে। হুকুম মত দরজার পাশে লাস আনবার পরে মৃতদেহর সঙ্গে সঙ্গে তাকেও তারা ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দেয়।

লালা মুসা থেকে এসে হাজির হলাম ওয়াজিরাবাদে। পাঞ্জাবের এই

শহরটি কিন্তু আজ প্রখ্যাত। সমগ্র ভারতবর্ষে পরস্পরকে হত্যা করার জন্য হিন্দু মুসলমান যে ছোরাছুরি ব্যবহার করেছিল, তার প্রায় সবগুলিই চালান গেছে এখান থেকে। ওয়াজিরাবাদের বৈশাখী মেলাও কিন্তু অত্যন্ত নামকরা···হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রাণমাতানো শস্যকাটার আনন্দ উৎসব। ওয়াজিরাবাদে পৌছে শুধু চোখে পড়ল চারদিকে অগুন্তি লাস পড়ে আছে। বহুদূরে, শহরের ওপর কালো ধোঁয়া উঠছে···স্টেসনের কাছাকাছি কোথাও উন্মত্ত জনতার চিৎকার, করতালি, হুল্লোড় হাসি, বাজনা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। বোধ হয় বৈশাখী উৎসব। কিছুক্ষণের মধ্যেই জনতা এসে হাজির হল প্লাটফরমের উপরে···নাচছে, কুঁদছে, গান গাইছে কতকগুলো নগ্ন মেয়েকে ঘিরে। হাঁ, সম্পূর্ণ উলঙ্গ মেয়ে···বৃদ্ধা যুবতী, কিশোরী, ছোট ছোট বালিকা—যারা নগ্নতার জন্য লজ্জা বোধের বয়সে পৌছয়নি এখনও। ঠাকুমা, নাতনী, মা, বোন, মেয়ে, স্ত্রী, কুমারী—এদেরই ঘিরে নাচছে, গান গাইছে, হুল্লোড় করছে পুরুষেরা। মেয়েরা সব হিন্দু ও শিখ, আর পুরুষেরা মুসলমান। এবং এই তিনে মিলে কি অদ্ভুত বৈশাখী উৎসবই না পালন করছে আজ! উন্নত শির ঋজুদেহী মেয়েরা হেঁটে চলেছে, মাথার উসকো খুসকো চুল খুলে পড়েছে, অপমানের চিহ্ন ফুটে রয়েছে সর্ব অঙ্গে। তবু তারা অত্যন্ত সোজা হ'য়ে মাথা টান ক'রে হেঁটে চলেছে; যেন তাদের লজ্জা ঢেকে রেখেছে কত শত সাড়ী; যেন তাদের সত্বাকে, সর্ব চেতনাকে আড়াল ক'রে ঢেকে রেখেছে করুণাময় মৃত্যুদেবতার ঘন কালো ছায়া। চোখে তাদের ঘৃণার চিহ্ন মাত্র নেই। লক্ষ সীতার সতী-গর্ব যেন জলছে সে-চোখগুলোয়। উপচীয়মান

জনতার আনন্দহারা কণ্ঠ চিৎকার ক'রে ওঠে: 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ! ইসলাম জিন্দাবাদ!! কায়েদ-এ-আজম মোহম্মদ আলী জিন্না জিন্দাবাদ!!!'

নাচিয়ে গাইয়েরা আর একটু সরে আসতেই আমার কামরার ভিতরের উদ্বাস্তুদের সোজাসুজি দৃষ্টিপথে এসে পড়ল এই অদ্ভুত মিছিলটি। জানালা থেকে তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নেয় মেয়েরা। শঙ্কায় লজ্জায় আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে। পুরুষেরা এগিয়ে গিয়ে জানালা বন্ধ ক'রে দেয়।

'বন্ধ করো না, খোলা রাখ,' চিৎকার ক'রে ওঠে বেলুচি সৈন্য: 'বাতাস আসতে দাও।'

সে-হুকুমে কান দেয় না কেউ, তারা জানালা বন্ধ ক'রে চলে।

সৈন্যরা গুলি ছোঁড়ে, কিছু উদ্বাস্তু মরে পড়ে যায়; অন্যরা এগিয়ে আসে জানালা বন্ধ করতে, তারাও এইভাবে পড়ে যায়, তারপর আর জানালা বন্ধ হয় না।

আমার গাড়ীর অভ্যন্তরে এই নবাগত নগ্ন মেয়েদের চাপিয়ে দিয়ে উদ্বাস্তুদের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হল। 'ইসলাম জিন্দাবাদ' এবং 'কায়েদ-এ-আজম মোহাম্মদ আলি জিন্দাবাদ' ব'লে বন্য চিৎকার ও হুল্লোড়ের মধ্যে আমাকে তারা বিদায় দিল।

একটি ছিপছিপে রোগা ছোট্ট ছেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে একটি মহিলার কাছ ঘেঁষে প্রশ্ন করে:

'মা, এইমাত্র তুমি বুঝি স্নান করলে?'

'...হুঁ, স্নান করিয়েছে আমার দেশের ছেলেরা, আমার ভাইরা আমাকে স্নান করিয়েছে—'

'তোমার কাপড় কোথায় মা?

'...আমার বৈধব্যের রক্ত-ছাপে সে-কাপড় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল! ভাইরা সে-কাপড় নিয়ে গেছে।'

চলন্ত গাড়ীর দরজা খুলে তমসাবৃত বসুন্ধরার বুকে ঝাপিয়ে পড়ল দুটি যুবতী মেয়ে। আঁৎকে চিৎকার ক'রে উঠলাম আমি, ঘন নিশিথীনির বুকে আমিও ঝাপিয়ে পড়ে ছুটলাম, যে পর্যন্ত না লাহোর স্টেসনে এসে পৌছলাম।

লাহোর স্টেসনের এক নম্বর প্লাটফরমে আমি এসে দাঁড়ালাম। আমারই উল্টোদিকে দু' নম্বর প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ব পাঞ্জাবের অমৃতসর থেকে আগত আর একটি ট্রেন। সে-ট্রেনে এসেছে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে মুসলিম উদ্বাস্তু। কিছুক্ষণ পরে একটি মুসলিম রক্ষী বাহিনী আমার কামরায় উঠে তল্লাসির নামে উদ্বাস্তুদের কাছে যা কিছু নগদ টাকাকড়ি অলঙ্কার দামী জিনিস ছিল, নিয়ে গেল। তারপর চারশ জন উদ্বাস্তুদের তারা নামিয়ে নিল হত্যা করবার জন্য। কারণ, অমৃতসর থেকে আগত ট্রেনটির ওপরে মাঝ পথে আক্রমণ হয়েছিল। সেই আক্রমণে চারশ জন মুসলিম উদ্বাস্তু মরেছিল এবং ধর্ষিতা হয়েছিল পঞ্চাশ জন মুসলিম রমনী। সুতরাং পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের মধ্যে সমতা রক্ষার জন্য হিন্দু ও শিখকে মরতে হবে, ধর্ষিতা হতে হবে পঞ্চাশ জন হিন্দু ও শিখ রমনীকে।

মোঘলপুরা স্টেসনে প্রহরী পরিবর্তন হল। বেলুচি গেল, এল শিখ রাজপুত ও ডোগরা প্রহরী। অতরী স্টেসনের পরে পটের পূর্ণ পরিবর্তন

হয়ে গেল। চারিদিকের মৃতদেহগুলি এবারে সব মুসলমান উদ্বাস্তুদের। কামরার ভিতরের হিন্দু শিখ উদ্বাস্তুরা বেশ বুঝতে পারছে যে আজাদ হিন্দুস্থানের সীমানায় ট্রেন এসে গেছে!

অমৃতসরে চারজন ব্রাহ্মণ উঠল একটি কামরায়। হরিদ্বারের যাত্রী তারা। মুণ্ডিত মস্তকের মাঝে লম্বা টিকি। চন্দন চর্চিত কপাল, রামনাম লেখা নামাবলি গায়ে। তীর্থ যাত্রায় বেরিয়েছে তারা। শিখ ও হিন্দুর ছোট ছোট দল কির্পান, বর্শা, বন্দুক নিয়ে পূর্ব পাঞ্জাবগামী প্রত্যেকটি গাড়ি অনুসন্ধান ক'রে দেখছে 'শিকার' পায় কিনা। ঐ চার ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে হঠাৎ শিকারীদের মনে একটু সন্দেহ জাগল। একজন প্রশ্ন করল :

'ব্রাহ্মণ দেওতা, গমন হচ্ছেন কোথায়?'

'হরিদ্বার।'

'হরিদ্বার না পাকিস্তান?' হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

'হরিদ্বারে যাবো গো, আল্লার নামে হলফ ক'রে বলছি!'

জাঠটি হেসে ওঠে। 'ঠিক হ্যায়, আল্লার নামে তোদের বলি দেব।' তারপর চিৎকার ক'রে ডাকে :

'নাথা সিং, ইধার, ইধার, শিকার মিলা।'

ব্রাহ্মণটিকে তারা হত্যা করল। বাকী তিনজন 'ব্রাহ্মণ' ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারবে কেন?

নাথা সিং চেঁচিয়ে বলে :

'হরিদ্বার যাবে বামুন বাবা? তা হ'লে আগে তো একবার ডাগদারী পরীক্ষা করতে হবে, দেওতা।'

'ভাগদারী পরীক্ষা' দেখিয়ে দেয়, নাথা সিংরা যা দেখতে চেয়েছিল, সুন্নত আছে কিনা। বাকী তিনজন 'ব্রাহ্মণ'-কেও এই ধরাধাম ত্যাগ করতে হল।

আমি ছুটে চলেছি। হঠাৎ একটি গহন বনের পাশে শিকল টেনে আমাকে থামান হল। পরমুহূর্তেই চিৎকার শুনলাম: 'সত্‌শ্রী আকাল' 'হর হর মহাদেও!' তারপর দেখি হিন্দু শিখ উদ্বাস্তরা ও প্রহরারত সৈন্যরা অরণ্যের দিকে ছুটে চলেছে। ভাবলাম, মুসলমান আক্রমণকারীদের ভয়ে বোধহয় জীবন-ভয়ে এরা পালাচ্ছে। একটু ভাল ক'রে তাকিয়ে বুঝলাম, আমারই ভুল হয়েছে। নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য অরণ্যের দিকে তারা ছুটে যায়নি, তারা ছুটে গেল অন্যের জীবন হরণের জন্যে। কয়েক শ' মুসলমান কৃষাণ তাদের বৌ বাচ্চা নিয়ে এই বনে পালিয়ে আছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ। বিজয়োল্লাসে চিৎকার করতে করতে ফিরে আসে বীরপুংগবরা। ভল্লার মাথায় একটি মুস্লিম শিশুর মাথা বিঁধিয়ে নিয়ে ভল্লা নাচাতে নাচাতে বিজয়গর্বে গান ধরেছে জনৈক জাঠ: 'আয় বৈশাখী, আয় বৈশাখী, হো হো···!'

জলন্ধরের পাশে এক মুসলিম পাঠান গ্রাম আছে। শিকল টেনে আবার তারা আমাকে থামিয়ে সেই গ্রামের উপর হামলা করল। বীরের মত দাঁড়িয়ে শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে পাঠানরা সে-আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করল। কিন্তু সংখ্যাধিক্য আক্রমণকারীর পর্যাপ্ত অস্ত্রের সম্মুখে তারা দাঁড়াবে কতক্ষণ? গাঁয়ের সমস্ত পুরুষ প্রাণ দিল লড়াইয়ে। এবার

এল মেয়েদের পালা। উন্মুক্ত বিশাল ক্ষেতের মাঝে, পিপুল শিশম সারেন গাছের নিচে অপমানিত হল তাদের নারীত্ব। পাঞ্জাবের এই সুফলা ক্ষেতেই হিন্দু মুস্লিম শিখ কৃষান একত্রে মিলে ফলাতো সোনার শস্য; এখানেই সবুজ সরষে গাছের হলদে ফুলে ফুলে বিস্তীর্ণ মাঠ ক্ষেত স্বপ্নের দেশে পরিণত হত। এই পিপুল শিশমের নিচেই মাঠের কাজে পরিশ্রান্ত কৃষাণ স্বামীরা অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকত তাদের প্রিয়ার হাতের লস্সির জন্য। এখান থেকেই তারা দেখত গাঁয়ের পথ দিয়ে আগত প্রিয়ার কাফিলা···কাঁধে কাঁখে লস্সির ঘড়া, বয়ে নিয়ে আসছে মধু মাখন ও তাদেরই ক্ষেতের সোনার গমের চাপাটি। বিমোহিত দৃষ্টি মেলে কৃষাণ দেখত প্রিয়ার কাফিলায় তার বিশেষ প্রিয়াকে, চোখের মণিতে পল্লবের মত নাচতে থাকত তার সুপ্রিয়া। এই তো পাঞ্জাবের চেহারা, পাঞ্জাবের প্রাণকেন্দ্র, পাঞ্জাবের হৃদয়-আলেখ্য। এখানেই জন্মেছিল সোহ্নী ও মহীওয়াল, হীর ও রান্ঝা। আর এখন! পঞ্চাশটি নেকড়ে; পঞ্চাশটি সোহ্নী আর পাঁচশো মহীওয়াল! সে-দিন কি আর ফিরে আসবে, সে-দুনিয়া কি আর ফিরে পাব? ধীর শান্ত চিনাব কি আর বইবে? আর কি সেই হীর, রান্ঝা, সোহ্নী, মহীওয়াল, মির্জা সাহেবানের গীত আমাদের হৃদয় তন্ত্রীতে বেজে উঠবে না?···আকাশ ভেঙে অভিসম্পাত বর্ষিত হোক এইসব নেতাদের মাথার ওপরে, তাদের সাতপুরুষ বংশধরদের উপরে, যারা এই সোনার দেশকে, প্রাণবন্ত বীরভূমিকে খণ্ডবিখণ্ড ক'রে দিল, অসম্মান, ছলনা, হত্যা, নোংরামীর কর্দমে দিল দেশকে ডুবিয়ে, প্রাণশক্তিকে উপদংশাক্রান্ত ক'রে যারা আজ দেশের সর্বাঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে

হত্যা, লুট ও বলাৎকারের বিষাক্ত ক্ষত। পাঞ্জাব যে আজ মরে গেল, পাঞ্জাবের কৃষ্টি যে গেল ধ্বংস হয়ে, দেশের সেই গান যে গেল হারিয়ে, সাহসপূর্ণ দিলখোলা সেই সরল প্রাণ যে গেল ভেঙ্গে…। আমার চোখ নেই, কান নেই, আমি জানি, তবুও যেন এ-দেশের মৃত্যুর পদধ্বনি আমার কানে এসে লাগে।

সৈন্য ও উদ্বাস্তুরা ফিরে এল, সঙ্গে নিয়ে এল পাঠান স্ত্রী ও পুরুষদের মৃতদেহ। কয়েক মাইল চলার পর একটি খাল এলে আমাকে আবার থামান হলো। খালের জলে সব লাসগুলো ফেলে দেওয়া হলো। আমি আবার রওনা হলাম। রক্ত ও ঘৃণার স্বাদ গ্রহণ ক'রে এবার তারা বসল তাড়ির হাঁড়ি খুলে আনন্দ পাবার জন্য।

লুধিয়ানা স্টেশনে আবার থামলাম। লুটেরা ছুটল শহরে। মুস্লিম মহল্লা ও দোকান লুণ্ঠন ক'রে তারা স্টেশনে ফিরে এল দু'ঘণ্টা পরে। সমস্ত পথটি ধরে চলে এইভাবে হত্যা ও লুণ্ঠন। আমার মন যেভাবে ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে উঠেছে, আমার গাড়িগুলোর সর্বদেহে চাপ চাপ রক্তের ছাপে এত নোংরা জমে উঠেছে যে স্নানের জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে পড়লাম, কিন্তু আমি জানতাম আমার এই দীর্ঘ কঠিন যাত্রাপথে কেউই আমকে তা দেবে না।

মাঝ রাত্রে এসে পৌছলাম আম্বালায়। মিলিটারী প্রহরায় একজন মুস্লিম ডেপুটি কমিশনার, পরিবার ও শিশু সন্তান সহ এসে উঠলেন আমার প্রথম শ্রেণীর একটি কামরায়। তার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য কড়া হুকুম ছিল মিলিটারীদের উপর।

রাত দুটোয় আম্বালা ছাড়লাম। মাত্র মাইল দশেক এগিয়েছি, এমন

সময় কে যেন শিকল টেনে আমার গতিরোধ করল। উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারীটির প্রথম শ্রেণীর কামরাটি ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। বাইরে থেকে কামরার জানালা ভাঙ্গা হলো। গাড়ির ভেতরে ডেপুটি কমিশনারকে, তার স্ত্রী ও তিনটি শিশু সন্তানকে হত্যা করা হলো। সঙ্গে ছিল অফিসারটির সুন্দরী যুবতী কন্যা। তাকে তারা হত্যা করল না। অফিসারের টাকা পয়সা অলঙ্কার যা ছিল এবং তার সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে হত্যাকারী লুটেরারা নামল কামরা থেকে। নিয়ে গেল তাকে লাইনের পাশের জঙ্গলে। মেয়েটির হাতে ছিল একখানা বই।

কি করা যায় মেয়েটিকে নিয়ে? তাকে বাঁচতে দেওয়া হবে, না, হত্যা করা হবে? বসল আলোচনা সভা। মেয়েটি বলল: 'হত্যা করবে কেন আমাকে? ধর্মান্তরিত ক'রে নাও আমাকে। তোমাদের কাউকে আমি বিয়ে করব।'

'ঠিক কথা', একজন যুবক বলে: 'আমার মনে হয়, আমাদের উচিত—'

কথা শেষ হওয়ার আগেই আর একজন ছোরা বের ক'রে বসিয়ে দেয় মেয়েটির পেটে। বলে:

'অনেক গোল টেবিল বৈঠক হয়েছে, এবারে সব ফিরে চল।'

শুকনো ঘাসের ওপরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল মেয়েটি। হাতের বইটি গেল রক্তে ভিজে। সমাজতন্ত্রের উপর লেখা বইটি। বুদ্ধিমতী মেয়ে ছিল সে। হয়তো সে চেয়েছিল দেশের, জাতির, মানুষের সেবা করতে। হয়তো ভালবাসা চেয়েছিল সে···চেয়েছিল একজনের গভীর

সোহাগ ভালবাসা প্রেম-আলিঙ্গন···চেয়েছিল নিজের ছোট্ট শিশুর লাল-মাখানো চুম্বন। সে ছিল যুবতী, সে ছিল স্ত্রী, প্রেমিকা, মা, সুষমা মাখানো সুস্মিতা নারী, প্রকৃতির রহস্যময় সৃষ্টি। আর আজ, এখন, এই মুহূর্তে! ···জীবনহীন···গহন বনের মাঝে পড়ে আছে তার মৃতদেহ··· শৃগাল শকুনী গৃধিনীর খাদ্য! তারই পাশে পড়ে আছে বুদ্ধিমতী মেয়ের হাতের শোণিত-সিক্ত বইটি, 'সমাজতন্ত্রবাদ : মত ও পথ'। ···রক্তদন্তী পশুগুলির নখরাঘাতে সব গেল, সব হারাল।

আশাহীন নিশিথীনির আঁধার ভেদ ক'রে আমি ছুটছি। আমার কামরার অভ্যন্তরে বহন ক'রে নিয়ে চলেছি তাদের যারা তাড়ির মাদকতায় চুর হ'য়ে আনন্দোল্লাসের মাঝে চিৎকার করছে : 'মহাত্মা গান্ধীজি কী জয়!!'

অনেক দিন পরে আমি বম্বেতে ফিরে এসেছি। এখানে আমাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে ট্রেন-শেডের নীচে রাখা হয়েছে। আমার দেহে আর রক্তের দাগ লেগে নেই···এখন আর আমি শুনতে পাই না নরঘাতকদের সেই রক্ত জমানো অট্টহাসি। কিন্তু রাত্রে যখন আমি একা দাঁড়িয়ে থাকি, তখন প্রেতাত্মারা সব জেগে ওঠে। মৃতরা আবার যেন বেঁচে ওঠে, আমি শুনতে পাই আহতদের সেই চিৎকার, শিশু ও মেয়েদের সেই ত্রাস ও ভয়ের বুক-ভাঙ্গা ক্রন্দন। বারে বারে আমি ভাবি আমার যেন আর এই শেড ছেড়ে যেতে না হয় সেই ভয়ঙ্কর পথে। ···পাঞ্জাবের মাঠে ক্ষেতে আবার যেদিন হেসে উঠবে সেই সোনালী শস্য, সমগ্র ক্ষেত জুড়ে হলদে সরষে ফুলের দোলায় দোলায় আবার যেদিন গান ভেসে

যাবে, শোনা যাবে হীর ও রান্‌ঝার সেই শাশ্বত প্রেমগীতি···হিন্দু মুসলমান শিখ কৃষাণ আবার যখন একসঙ্গে মিলে ক্ষেতে দেবে চাষ, রুইবে বীজ, কাটবে শস্ত ; আবার যখন মেয়েদের প্রতি সেই প্রাণ-উজাড় করা প্রেম, বিশ্বাস, সম্মানবোধ ফিরে আসবে কৃষাণের মনে, আমি তখন আবার যাব, আবার ছুটব পাঞ্জাবের স্থন্দর গাঁয়ের ভেতর দিয়ে, দৌড়ে দৌড়ে ছুটে ছুটে যাব সেই দরাজ দিল সাধারণ মান্নুষের দেশে।

শুকনো কাঠ দিয়ে তৈরী আমার দেহ, কিন্তু তবুও আমি চাই না যে প্রতিহিংসা ও ঘৃণা ভর্তি ক'রে আবার আমাকে তোমরা পাঠাও ঐ বীভৎস নারকীয় যাত্রাপথে। তোমরা আমাকে পাঠাও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলে খাদ্য ভর্তি ক'রে। আমাকে পাঠাও শিল্পাঞ্চলে কয়লা লোহা তেল বয়ে নিয়ে যেতে। সার ট্রাকটর ভর্তি ক'রে আমাকে পাঠাও গাঁয়ের কৃষাণদের ঘরে। মৃত্যু ও ধ্বংস বয়ে নেওয়ার কাজে আমাকে ঠেলে দিও না তোমরা। আমি চাই আমার কামরায় উঠুক দেশের সম্পদশালী কৃষাণ ও শ্রমিক···তাদের সঙ্গে থাকবে তাদের স্থখী স্ত্রী ও শিশু। পদ্মফুলের মত তাদের হাসিমাখা মুখ। নতুন জীবন-পথে শিশুরা উঠবে বেড়ে, যেখানে মান্নুষ হবে মান্নুষ, হবে না হিন্দু ও মুসলমান, হবে ঠিক সেই আশ্চর্য জীবটি যাকে একটি কথায় বলা হয় 'মা-ন্নু-ষ !!'

মহালক্ষ্মীর পুল

মহালক্ষ্মীর পুলের ওপাশে একটি রত্নমন্দির আছে, সাধারণের কাছে যার পরিচয় ঘোড়দৌড়ের মাঠ নামে। এই মন্দিরের পূজারীদের মনস্কামনা প্রায়ই পূরণ হয় না, তবে অনেকেই এখানে সর্বস্ব খুইয়ে ঘরে ফেরে। ঘোড়দৌড়-মাঠের পাশ দিয়েই গেছে সহরের ময়লাবাহী প্রশস্ত উন্মুক্ত নর্দমা। মনের ময়লা ধুয়ে মুছে দেয় রত্নমন্দির, আর দেহের ময়লা বয়ে নিয়ে যায় এই নর্দমা। এবং এই দুয়ের মাঝে রয়েছে আমাদের এই মহালক্ষ্মীর পুল।

পুলের বাঁ-পাশে লোহার রেলিংএর ওপরে ছয়টি সাড়ী বাতাসে পত পত ক'রে উড়ছে। ওই একই স্থানে প্রতিদিনই রোদে শুকোতে-দেওয়া এই ছয়টি ধোয়া সাড়ী দেখা যায়। সাড়ীগুলোর মালিকদের মনতই সাড়ী-গুলোর দামও নিতান্তই কম। সহরতলীর ট্রেন থেকে প্রত্যেকদিনই পুলের ওপরে এই সাড়ী দেখা যায়। পরিশ্রান্ত যাত্রীদের চোখে মুহূর্তের জন্যে হলেও সাড়ীগুলোর কটা রং, ময়লা লালচে পিঙ্গল রং, নীল পাড়, লালের ছোপ, একটু নাড়া দেয়। ক্ষণিকের জন্যে হলেও নাড়া দেয়। পরমুহূর্তেই পুলের নীচ দিয়ে গাড়ী ছুটে চলে যায় লোয়ার প্যারেলের দিকে।

ধোয়া হলেও সাড়ীগুলোর রং কেমন যেন ভ্যাবডেবে।

রংএর সেই চকচকে ভাবটি আর নেই। কেনার পরে নূতন অবস্থায় রং বোধহয় এরকম ভ্যাবডেবে ছিল না। আনন্দমুখর উজ্জ্বলতা ছিল তার গায়ে, ছিল হাসি সেই রংএ। কিন্তু আজ আর তা নেই। বারে বারে ধোয়ার ফলে রংএর সে-উজ্জ্বলতাও গেছে। ধুয়ে মুছে যাওয়া ফিকে রংএর অভ্যন্তর থেকে সস্তা কাপাস ফুটে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের জীর্ণ দেহের বহু স্থান ছেঁড়া। এখানে ওখানে বড় বড় ফাড়গুলো কোনমতে কালো সুতো দিয়ে সেলাই করা। অনেক জায়গায় সেই সেলাইয়ের সুতোগুলো পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে। কতকগুলো সাড়ীর সেলাইয়ের জোড়ে যে মলিনতা জমে উঠেছে, বারে বারে ধোওয়ায়ও তা আর পরিষ্কার হয় না। জোড়ের ময়লার জন্যে সাড়ীগুলোকে আরও কুৎসিত লাগে, আরও বেশী নোংরা মনে হয়।

আমি এই সাড়ীগুলোর জীবনেতিহাস জানি, কারণ এদের ব্যবহার-কারীদেরও আমি চিনি। মহালক্ষ্মীর পুলের পাশের আট নম্বর মজুর বস্তিতে তাদের বাস। ঐ যে সামনের বস্তি দেখছেন, ঐখানে। আমিও ওখানে থাকি কিনা, সেই জন্যে আমি তাদের ভাল ক'রে জানি। ওদের সম্বন্ধে কিছু জানবার বাসনাও কি হয় না আপনার? প্রধান মন্ত্রীর স্পেশাল ট্রেনের জন্যই আপনি আমাদের এখানে অপেক্ষা করছেন, আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু তার তো এখনও কিছু দেরী আছে। আপনার এই প্রতীক্ষার সময় টুকুর মধ্যে সাড়ীর ইতিবৃত্তের কিছুটা যদি জেনে যান তো মন্দ কি!

একেবারে শেষ-প্রান্তের সাড়ীটা দেখছেন? হাঁ, তার পাশেরটাও ধূসর পিঙলে রংএর। তবে শেষেরটা আরও একটু বেশী কটা। আপনি বোধ হয় এদের রংএর তফাৎটা ঠিক ধরতে পারছেন না, আমিও যে সব সময় এদের জীবনের তফাৎটা ঠিক ধরতে পারি, তা নয়। সকলেই প্রায় একরকম, অদ্ভুত সাদৃশ্য···! তবে হ্যাঁ, একেবারের বাম প্রান্তের সাড়ীটা একটু বেশী পাণ্ডুর, আরেকটু বেশী পিঙ্গল বর্ণের। এই সাড়ীটা শান্তা বাইয়ের। তার পরেরটা জীবন বাইয়ের।

শান্তা বাইয়ের জীবনটাও তার জীর্ণ সাড়ীটার মত কেমন ফ্যাকাশে মেরে গেছে। বড়লোকের বাড়ীর বাসন-মেজে তার জীবিকা অর্জন করতে হয়। তিনটি সন্তানের মা সে। একটি মেয়ে, দুটি ছেলে। মেয়েটি বড়, বয়স ছয়। ছোট ছেলেটির বয়স মাত্র দুই। স্বামী সেহ্নন কাপড়-কলের মজুর। উষাবসানে তাকে ছুটতে হয় কলে। ভোরে উঠে রান্না বসালে শান্তা বাইয়ের চলে না, তাকে আগের রাতেই পরের দিনের রান্না সেরে রাখতে হয়। কারণ, তাকেও তো আবার পরের বাড়ীর বাসন মাজতে ছুটতে হয় সেই সাত-সকালে। আর, স্বামীর আগেই শান্তাকে বেরোতে হয়···সঙ্গে নিয়ে যায় মেয়েকে। কারণ, এখন থেকেই তো তাকে কাজকম্ম শিখতে হবে। শিখতে হবে বাসন-মাজার সমৃদ্ধিপূর্ণ কলাবিদ্যা! সেই সাত-সকালে বেরিয়ে মায়ে-ঝিয়ে বস্তির গৃহে ফিরে আসে বেলা দুটোয়। তখন পড়ে তাদের উনুনে আঁচ, সুরু হয় রান্না-বান্না। সব বাড়ীর উনুন যখন নেভে, শান্তার ঘরে উনুন তখন জ্বলে।···বেলা দু'টোর পরে আর রাত দশটার পরে। এর আগে তাকে তো পরের সেবায় ব্যস্ত

থাকতে হয়। তবে মেয়ে তো এখন বড় হয়েছে, ছ' বছর বয়স তার, মাকে সে সাহায্য করে। মা বাসন মাজে, আর ছ' বছরের বড় মেয়ে ছোট্ট ছোট্ট হাত দিয়ে বাসন ধোয়। ধুতে ধুতে হয়তো কখনও কখনও দু'একটা ডিস্ ভেঙে যায়। যেদিন দেখি ছোট্ট মেয়েটির কচি গাল বেশী লাল, চোখছুটো ফোলা, তক্ষুণি আমি বুঝতে পারি, কোন বড়লোকের বাড়ীতে ডিস্ ভাঙ্গা গেছে। সেদিন আর শান্তা বাইও হেসে কথা কয় না। তার বস্তির ঘরে সে প্রবেশ করে গালমন্দ অভিসম্পাত করতে করতে। রাগে গজ গজ করতে করতে ধরায় উন্থুন। তখন তার উন্থুনে আঁচ থেকে হয় বেশী ধোঁয়া। আর ঐ ঘুঁটের ধোঁয়া নীরবে সহ্য করতে পারে না দু' বছরের কচি ছেলেটি। সুরু হয় তার পরিত্রাহি ক্রন্দন। ক্রোধান্বিত শান্তা বাইয়ের গলা রাগে বিরক্তিতে আরও সপ্তমে ওঠে, তারপর ছুটে এসে ধ্রুম ধ্রাম বসিয়ে দেয় কিল-চাপড় দু'বছরের শিশুর গালে পিঠে। মুহূর্তে শিশুর কচি-গাল ভাঙ্গা মাটির বাসনের মত লাল রংএর ছিটেতে যায় ভরে। আরও জোরে কাঁদে শিশু, আরও বেশী চিৎকার করে মা…। সব সময়ে দেখি ছেলেটি কেবল কাঁদে, প্যান প্যান করে; শিশুর সেই দিলখোলা হাসি নেই, ঠোঁঠেও নেই স্মিত হাসি, এমন কি মৃদু দাঁত-দেখানো কষ্ট-হাসিও ফোটে না তার মুখে। কেন পারে না হাসতে আমাদের এই ছোট্ট মানুষটি? সব সময়ে কেবল কাঁদবে আর খাওয়ার জন্য ঘ্যান ঘ্যান করবে। পাজিটার খিদে যেন সব সময়ে লেগেই আছে। দু বছর বয়স, কিন্তু ছিটে ফোঁটা দুধও কোন দিন পড়েনি ওর মুখে। দুধের দাম তো নাগালের বাইরে। সুতরাং আমাদের এই বস্তির সমবয়স্ক সব শিশুদের

মতনই ও-ও খায় মাইলোর মোটা রুটি। আমাদের বস্তির বাচ্চাদের মায়ের বুকের দুধ জোটে প্রথম ছয় মাস পর্যন্ত; কারণ মায়েদের বস্তি ছেড়ে যেতে হয় মজুরী খাটতে মিলে, আর আমাদের দেশের মিল-প্রাঙ্গণে শিশু-রক্ষণাগারের তো কোন বালাই-ই নেই। সুতরাং এই সব হতভাগ্য বস্তি শিশুদের বেড়ে উঠতে হয় মোটা মাইলো খেয়ে। মোটা মাইলো আর ঠাণ্ডা জল। উলঙ্গ শিশুরা রোদে ঘোরে। রাত্রে ছেঁড়া চটের উপরে পড়ে ঘুমোয়। পেটে খিদে নিয়ে শোয়, আর নিশাবসানে জেগে ওঠে আরও বুভুক্ষা নিয়ে। বুভুক্ষা-প্রপীড়িত দেহ-মনের ক্ষুন্নিবৃত্তির পূরক হয় মোটা মাইলোর শুকনো রুটি আর ঠাণ্ডা জল। তাদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে এই বুভুক্ষাও। শিশু বয়স থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত তাদের পেটে, মনে, মাথায়, সর্বসময়ে হাতুড়ীর মত কি যেন কেবল ঠুকছে: ঠুক্, ঠুক্, ঠুক্! সব সময় এই ঠোকা চলেছে···হাঁটছে, খাটছে, হাসছে কিংবা ঘুমোচ্ছে—কোন সময়েই এই হাতুড়ী ঠোকার যেন আর বিরাম নেই···ঠুক-ঠুকানী চলেইছে। শুধু হপ্তা-দিনে পকেটে যখন গোটা কয়েক টাকা পড়ে, তখন যেন ঠুক-ঠুকানীটা ঠিক বোঝা যায় না। গরম পকেটে সোজা তাড়ির দোকানে গিয়ে ঢক্ ঢক্ ক'রে গলায় কিছু তাড়ি ঢেলে তারা এই বুভুক্ষার কঠিন ভারী ঠুক-ঠুকানী ভুলতে চায়। তাড়ি গেলে আর ঘণ্টা কয়েকের জন্য শিরা উপশিরার দেয়ালে ও মগজের স্নায়ুতে সে-ঠুক্‌ঠুকানী যেন আর বোধহয় না···চেতনা-হারা হয়ে নিদ্রাবস্থায় থাকে পড়ে—বিস্মৃতির গহ্বরে ঠেলে ফেলে দেয় নিজেকে, ভুলে থাকে আশেপাশের কঠিন বাস্তবতা। কিন্তু এই তাড়ি পান তো সম্ভব শুধু ঐ

মাইনের দিনে। মাইনের পর ছু' একদিন পর্যন্ত টেনেটুনে হয়তো চলতে পারে জন কয়েকের। কিন্তু তারপরে তো আর সম্ভব নয়। ঘর ভাড়া দিতেই হবে, র‍্যাসনের দামের ব্যবস্থাও রাখতেই হবে। তারপর আছে তেল নুন লঙ্কা কেনা। তরকারী, কয়লা? তাড়ির পয়সা আসবে কোত্থেকে? একটা নতুন পিরান? আঃ! আবার জল ও বাতির জন্যেও তো টাকা দিতে হবে! শান্তারও তো একটা শাড়ী দরকার। ওর সাড়ীও একেবারে ছিঁড়ে গেছে। কোন কাজের না এই মিলের সাড়ীগুলো। দাম নেবে সওয়া পাঁচ টাকা, কিন্তু টিকবে না ছ' মাসের বেশী। ষষ্ঠ মাসে নতুন সাড়ী কিনতেই হবে, না হ'লে সেই শতছিন্ন কাপড়ে হাজার সেলাই ও তালি মেরেও সপ্তম মাসে তাকে ব্যবহার করা দুরূহ। সপ্তম মাসের পরেও সেই তালি মারা জীর্ণ শাড়ীর ব্যবহার কল্পনাতীত। আবার সওয়া পাঁচ টাকা খরচ করতেই হবে। গভীর পাটকিলে রংএর আর একখানা সাড়ী আনতে হবে শান্তা বাইএর জন্য। এই রংই শান্তার পছন্দ, কারণ এই রংএ ময়লার রং ঢাকা পড়ে। বাসন মাজা, কয়লা ভাঙ্গা, জল টানার কাজ করতে হয় তাকে। সুতরাং তার সাড়ীর রং হবে পাটকিলে। বড় ঘরণীদের মত মনমাতানো রামধনু রংএর দিকে তার নজর রাখলে চলে না। ও-সব তো কল্পনাতীত। তিন সন্তানের মা শান্তা বাই। মিল মজুরের স্ত্রী শান্তাবাই...

কিন্তু শান্তাও একদিন স্বপ্ন দেখেছে রামধনু রংএর সাড়ী পরার। ধাওয়ারের গাঁয়ে তারও চোখে ভেসে উঠত প্রেমের গোলাপী মেঘের অদ্ভুত সৌন্দর্য। গাঁয়ের মেলায় আসত কত রংবেরঙের দ্রব্যসম্ভার। বাপের

ধান ক্ষেতে ঘন সবুজের ঢেউ যেত খেলে। একটা পেয়ারা গাছ ছিল তাদের···সোনালী হলদে রংএর পাকা পেয়ারাগুলো কি রকম চক্ চক্ করত গাছে! ওঃ, আজ সে-সব রং গেছে মুছে। আজ শুধু জীবনে কটা পাটকিলে রংএর মেলা! বাসন মাজতে মাজতে, হেঁসেলে রান্না চাপিয়ে কিংবা পুলের ওপরে ভিজে জীর্ণ সাড়ী শুকোতে দিতে গিয়ে শান্তাও ভাবে তার সেই অতীত জীবনের রঙীন স্বপ্নের কথা। নীচের রেলে টস টস ক'রে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে···শান্তার চোখের জল, না, ভিজে সাড়ীর ফোঁটা? কিন্তু কে ভাবে শান্তার জীবনের কথা? সহরতলীর ট্রেন-যাত্রীদের চোখে শুধু পড়ে কে একজন কালো কুৎসিত বিশীর্ণা নারী ভিজে সাড়ী শুকোতে দিচ্ছে পুলের বেড়ায়। পরমুহূর্তে পুলের নীচ পেরিয়ে ট্রেন ছুটে যায় প্যারেলের দিকে···

শান্তা বাইয়ের ভিজে সাড়ীর পাশের জীর্ণ সাড়ীটা হল জীবন বাইয়ের। একই রকম সাড়ী, সেই পাটকিলে রং, দাম এক, এবং তার উপরে যে জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে, তাও একই রকম—হয় তো একটু উনিশ বিশ তফাৎ। শান্তার সাড়ী থেকেও এই সাড়ীটি বেশী জীর্ণ··· গায়ে তার বড় বড় দু'টো ছেঁদা···অতি সাবধানে যত্নের সঙ্গে সে-ছেঁদা সেলাই করা হয়েছে। সাড়ীর মাঝের ঐ নীল তালিটা দেখছেন? আগের পরিত্যক্ত সাড়ী থেকে টুকরো নিয়ে এই তালিটি দেওয়া হয়েছে যাতে আরও কিছু দিন এই সাড়ীটি ব্যবহার করতে পারে জীবন বাই! জীবন বাই বিধবা···পুরানোর ওপরে নূতনের তালি দিয়ে টুটা ফুটা রঙ্ক

করেই জীবন চালাতে সে অভ্যস্ত। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করেই বর্তমানের তিক্ত জীবন সে ভুলে থাকতে চায়! মাতাল অবস্থায় স্বামী তার চোখে আঘাত দিয়ে একটা চোখ নষ্ট ক'রে দিয়েছিল, তবুও সেই মৃত স্বামীর কথা ভাবতে ভাল লাগে বিধবা জীবন বাইয়ের। মিল-মজুর বৃদ্ধ ধন্‌ধুর চাকরী সেই দিনই বোধ হয় খতম হয়েছিল···জীবন ও যৌবনের সবকয়টি বছর দিয়েছিল সে কারখানার সমৃদ্ধির পিছনে, বিরাট তার অভিজ্ঞতা···কিন্তু তাজা শক্ত-সমর্থ যুবক শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে আর এখন পারে না। ঘর্ঘর কাশির জন্য সে আরও উদব্যস্ত হ'য়ে পড়তো। সমস্ত জীবন ধরে তুলোর আঁশ গিয়ে জমেছে ফুসফুসে···মাকুতে যে-ভাবে জমে থাকে ঠিক সেইভাবে জমেছে ফুসফুসে। মৌসুমির সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে আসে আর্দ্রতা আর সেই সঙ্গে বৃদ্ধ অভিজ্ঞ মিল মজুর ধন্‌ধুর হাঁপানীর উৎপাতও বেড়ে ওঠে। কাশে তো কাশেই, কাশে তো কাশেই, সে-কাশি আর থামতে চায় না—হাঁপানির টান। শেষের দিকে ভীতিজনক মৃদু হা হা হা হা শব্দে অস্থির ধন্‌ধু হাঁপানীর টান সামলাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। তারপর একদিন সামান্য সুযোগে মিল ম্যানেজার দিল তার কাজ খতম ক'রে। কিছুই তার মিলল না—না বোনাস, না গ্রাচুইটি, না পেন্‌সন্‌। ছ মাস বাদে বৃদ্ধ ধন্‌ধু মারা গেল। মৃতদেহের ওপরে পড়ে জীবন বাই কত কাঁদাই না কাঁদল···সতীসাধ্বি হিন্দু স্ত্রীর মত সে পড়ে পড়ে কাঁদল। তাকে কানা ক'রে দিয়েছিল বৃদ্ধ? সে তো আর ইচ্ছে ক'রে দেয় নি, মদ খেয়ে চেতনা-হারা হ'য়ে গিয়েছিল যে তখন। চাকরী যদি না যেত তাহ'লে কি আর এভাবে তাকে মারত?

ঠিক ভাবতে পারে না জীবন। তিরিশ বছর বিবাহিত জীবন তারা কাটিয়েছে এক সঙ্গে কত সুখে। মাতাল অবস্থায় হঠাৎ একদিন স্বামীর মারের জন্য সমস্ত জীবনের সব সুখের স্মৃতি কি ভুলে যাওয়া যায়? ধনধু তো দয়ামায়াহীন ছিল না। জীবনের পয়ত্রিশটি বছর যে-কলে সে দিয়ে এল, সেখান থেকে নির্দয়ভাবে তাকে তাড়িয়ে দিল! একবার ভাবলও না তার কথা ম্যানেজার? বোনাস না, গ্রাচুইটি না, পেন্‌সন্ না! একটি পয়সা পর্যন্ত সে দেয়নি ধন্‌ধুকে। পয়ত্রিশ বছর আগে খালি-হাতে ধনধু ঢুকেছিল এই মিলে গতর খাটতে। পয়ত্রিশ বছর পরে তার পরিচয়-চাকৃতি যখন নিয়ে গেল মিল গেটে, হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ধন্‌ধু। কে-যেন ভীষণ নাড়া দিল তার সমস্ত অস্তিত্বকে। জীবনের পয়ত্রিশটি বছর ধরে সে দিয়ে গেল তার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য এই কারখানার গহ্বরে, ঢেলে দিয়ে গেল দেহের বিন্দু বিন্দু শোণিত ধারা, মানব দেহের সমস্ত সৌন্দর্য-সৌষ্ঠব, আর আজ তাকে কারখানার অধিকর্তারা ছুঁড়ে ফেলে দিল আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালের মত! হতভম্ব গম্ভীর ধন্‌ধু আশ্চর্য হয়ে মুখ তুলে একবার তাকাল সামনের প্রশস্ত মিল গেটের দিকে, নতুন দৃষ্টি তার চোখে···বিরাট দানবের মত কারখানার চিমনিটা হা ক'রে তাকিয়ে থাকে রস-রক্ত-হীন মানবদেহী ছিবড়ে ধন্‌ধুর দিকে। আশাহীন ধন্‌ধু হারিয়ে ফেলে সব কিছুর সূত্র। ওয়াক্ থু ক'রে থুথু ফেলে হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে নিরাশার সায়রে যায় সে ডুবে। তারপর জীবনের সমস্ত দুঃখ নৈরাশ্য ভুলতে সে পা বাড়ায় তাড়িখানার পথে।

কিন্তু জীবন বাইয়ের ধারণা যে তার আহত চোখের সুচিকিৎসার

জন্য যদি সে টাকা খরচ করতে পারত তবে তার চোখটি নষ্ট হতো না। দাতব্য চিকিৎসালয়ের বারান্দায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দরদহীন ডাক্তার নার্সদের দানের সামগ্রীর মত আমলাতান্ত্রিক কায়দায় চিকিৎসা বিতরণের চিকিৎসাহীন থাকায়ই তার চোখটা গেল। শেষে চোখটি খুইয়ে জীবন বাই যখন ভাল হ'য়ে উঠল, ধনুধু পড়লো বিছানায়। সেই শোওয়াই তার শেষ শোওয়া। বিছানা ছেড়ে আর তাকে উঠতে হয় নি। জীবন বাইয়ের দুরবস্থা দেখে শান্তাই গিয়েছিল এগিয়ে। বড়লোকের বাড়ীতে বাসন মাজার কাজ জুগিয়ে দিয়েছিল শান্তাই। বৃদ্ধা, দৃষ্টিহীন জীবন বাই, সমস্ত দেহের জোর লাগিয়ে বাসন মাজতো, কিন্তু শান্তার মাজা বাসনের মত অত চক্‌চকে হতো না তার বাসন মাজা। পরিষ্কার-বাতিকগ্রস্ত ধনী গৃহিনীরা জীবন বাইয়ের মন্থর কাজের জন্য কেবল মুখ খিঁচোত। জীবন বাইকে তো জীবিকা অর্জন করতেই হবে—একজনের না দু'জনের ; সুতরাং ধনী গৃহিনীদের সে-মুখ খিঁচোনী নীরবে সয়ে যেতো সে। জীবন বাইয়ের নীরবতায় ধনী ঘরণীরা আরও যেত চ'টে।

তারপর একদিন ধনুধু গেল মারা। জীবন বাই একলা, কেউ নেই তার, কাউকে আর খাওয়াতে হবে না গতর খেটে। ···বহুদিন আগে যুবতী বয়সে জীবন বাইয়ের একটি মেয়ে হয়েছিল। বয়সকালে এক লম্পটের সঙ্গে সে গিয়েছিল পালিয়ে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার কোন অনুসন্ধানই এতদিন পায় নাই জীবন বাই। তারপর একদিন সে শুনলো ফরেস রোডের এক বেশ্যা-গৃহে তার মেয়েকে দেখা গেছে। পরণে তার রেশমী সাড়ী। বিশ্বাস হয়নি জীবন বাইয়ের। সমস্ত জীবন

সে নিজে পরে এল সওয়া-পাঁচ-টাকা দামের মজুরানীদের পাটকিলে রং-এর সাড়ী, আর তার মেয়ে পরবে রেশমী সাড়ী? আর পরবেই বা কেন তার মেয়ে? নিজেও তো কোন দিন সে পরে নি। জলের সঙ্গে কোনমতে শুকনো রুটি গিলে, সওয়া-পাঁচ-টাকার সস্তা সাড়ী পরে, দারিদ্র্যের মধ্যে তারা সকলে মিলে সম্মানের সঙ্গে বাস করেছে এই বস্তিতে। কেন যাবে তার মেয়ে রেশমী সাড়ী পরার অসম্মানের সস্তা জীবন পথে? বিশ্বাস হয় না জীবন বাইয়ের। তার মেয়ে পালিয়ে গেছে তার আদমিটির জন্যে, সাড়ীর জন্য নয়। বেচারা! জীবন বাইয়ের মনে পড়ে তার নিজের যুবতী বয়সের কথা। ধন্ধুর জন্যে কি রকম উতলা হয়ে উঠেছিল সেই বয়স-কালে। তিরিশ বছর আগে সেও তো বাপের ঘর ছেড়ে ধন্ধুর সঙ্গে চলে এসেছিল। তার মেয়েও তাই করেছে।

মৃত ধন্ধুকে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় জীবন বাই হঠাৎ দেখে চক্‌চকে রেশমী সাড়ী পরা কে এক যুবতী মেয়ে এসে ধন্ধুর পায়ের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে শিশুর মত কাঁদতে থাকে। হঠাৎ সর্বচেতনায় এক বিরাট ধাক্কা খেয়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জীবন বাইয়ের মনে হয় যেন তার সব কিছু হারিয়ে গেল···সমস্ত জীবন ধরে যা-কিছু অতি সম্মানের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে ছিল, সব হারিয়ে গেল, সব মরে গেল। স্বামী মরে গেল, মেয়ে হারিয়ে গেল। ভেঙ্গে গেল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ— সর্বরিক্ত হয়ে গেল জীবন বাই। সমস্ত জীবন সে বাঁচবে কিসের ওপরে? সমস্ত জীবনের সম্মানবোধ যে গেল এক মুহূর্তে উড়ে! নিঃসঙ্গ, একাকী, অপমানিত, সর্বরিক্ত জীবন বাইয়ের মনে প্রশ্ন জাগে: এ কোন্ দুনিয়ায়

তারা বাস করে যেখানে জীবন ভোর খেটে গেল তার সর্বহারা স্বামী, যেখানে হারাতে হল তার চোখ, যেখানে তার মেয়েকে দিতে হয়েছে নারীত্বের বলি, ডুবে যেতে হয়েছে অসম্মানের পঙ্কিলে। মনে হয়, কি এক বিরাট অন্ধ কারখানার দাঁতালো লৌহ-চক্রের নিষ্পেষণে তারা সকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে অহরহ, সজীব মানুষগুলোকে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে আঁখ মাড়াই কলের মত জীবনের সমস্ত রস নিংড়ে নিয়ে কঠিন নির্দয় হাতে দূর ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে আঁখের ছিবড়ের মত : প্রাণহীন, রসহীন কর্মহীন, গৃহহীন, সর্বরিক্ত মানুষগুলো। দুহাতে ধাক্কা মেরে মেয়েকে সরিয়ে দিয়ে জীবন আকুল কণ্ঠে কাঁদতে থাকে। সে-কান্না সে কোন দিন কাঁদে নি জীবনে।

* * *

তৃতীয় সাড়ীটির যে কি রং আমিও ঠিক ধরতে পারছি না। পীত-পাটকিলের সংমিশ্রণ, না, আকাশী-নীল পাটকিলের? কোনো সময়ে মনে হয় পাটকিলে থেকে হলদেটের ছোঁয়াই যেন বেশী। আবার পর-মুহূর্তে মনে হয় পাটকিলে থেকে নীলই বোধহয় বেশী। এ-সাড়ীটি হল আমার স্ত্রী সাবিত্রীর। বোম্বের ফোর্ট অঞ্চলের 'ধানুভাই ঝানুভাই' কোম্পানীর কেরানী আমি। মাইনে পাই মাসে পয়ষট্টি রুপেয়া। সেমুন মিলের মজুরদের মাইনের মত। সুতরাং আমাকেও বাস করতে হয় এই বস্তিঘরে। খেয়াল রাখবেন মশাই, আমি কিন্তু মজুর নই, আমি কেরানী। আমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, আমি টাইপ করতে পারি। আমি ইংরাজী বলতে পরি, এমন কি, আমাদের প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতাও আমি বুঝতে

পারি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর স্পেশাল ট্রেন এখান দিয়ে যাবে। না, না তিনি ঘোড়দৌড় মাঠে আসছেন না। তিনি আসছেন চৌপাট্টির সভায় বক্তৃতা দিতে। লক্ষ লক্ষ লোক যাবে তাঁর বক্তৃতা শুনতে। আমিও যাব। আমার বেশ লাগে তাঁর বক্তৃতা শুনতে। সাবিত্রীরও ভাল লাগে। আমার সঙ্গে সেও চৌপাট্টির সভায় যেতে চেয়েছিল। কিন্তু যাবে কি ক'রে? আমাদের আটটি সন্তান। আটটি সন্তানের মা সংসার ফেলে বক্তৃতা শুনতে যেতে পারে? আমাদের একটি ভাড়াটে ঘরে আটটি সন্তান নিয়ে বাস করা যে কি ব্যাপার মশাই, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। না পাবেন একটু ঘুমুবার জায়গা, না একটু নিরিবিলি কাজের, না রান্নার। তারপর যা আয়! ঘোমটা টানলে পিঠের কাপড় থাকে না। মাসিক মাইনে। সাপ্তাহিক র‍্যাসন। বেঁচে থাকার দৈনিক সংগ্রাম…। মাসের পনর দিন চলে মাইনের টাকায় কোন মতে—প্রথম পনর দিন। আর বাকী অর্ধেক মাসের খরচার জন্য শরণাপন্ন হতে হয় সুদখোর বেনিয়া কিংবা কাবুলিওয়ালার দ্বারে।

আমার ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানো, স্কুলের মাইনে বই কাপড়চোপড় জোগাড়!—সত্যি কথা বলতে কি, মশাই, আমি পেরে উঠি না। ইচ্ছে থাকলেও সে-ট্যাক্স বহন করা আমার ক্ষমতার বাইরে। আমি যখন বিয়ে করি সাবিত্রীকে, কত সুমধুর স্বপ্নই না দেখতাম তখন আমরা দুজনে। সেই স্বপ্নের একটি ছিল ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা। তখন সাবিত্রী সত্যিই কত কিছু কত সুন্দরভাবে ভাবতে পারত। বৃহৎ বিরাট কিছু নয়, দৈনন্দিন জীবনেরই ছোটখাট জিনিসের উপরেই ছিল তার সুমধুর কল্পনা…সজীব

সবুজ বাঁধাকপির পাতার মত সতেজ সে-স্বপ্ন। আমার সুপ্রিয়া সাবিত্রীর মুখে সে-ভাষা সে-স্বপ্নের কথা আর তো শুনতে পাই না আজ আমি! জীবন-যুদ্ধে অস্থির সাবিত্রীর ভ্রু-কুঁচকোন মুখের উপরে ঝুলে থাকে এখন বিমর্ষতা, যে-কোন সামান্য ত্রুটির জন্য রণং দেহি মূর্তিতে ঝাপিয়ে প'ড়ে সে ক্রমাগত মারছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের, অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাকে সরে যেতে বলে সে সাবধান করে দেয় আমি যেন এসব ব্যাপারে মোটেই নাক না গলাই। কি যে হয়েছে আমাদের, আমি বুঝতে পারি না। বাড়ীতে যতক্ষণ আছি, বৌর মুখ ঝাঁকানী শুনছি; এলাম অফিসে, বড়সাহেব সুরু করলেন রাগারাগি গালমন্দ। আমিও আবার গালাগালের খিটখিটে মেজাজের চক্র ঘুরিয়ে দিই পিয়নদের ওপরে। কোথায় কি যেন একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। সময় সময় মনে হয় সাবিত্রীর জন্য একটা সাড়ী কিনে নিয়ে যাই। আবার মনে হয়, শুধু সাড়ী নয়; সাবিত্রীর দরকার অন্য কিছুর, প্রয়োজন সম্পূর্ণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের···দরকার নতুন গৃহের, নতুন জীবনের···

কিন্তু আমি এত কথা ভাবছি কেন? আমাদের প্রধান মন্ত্রী তো বলেছেন শুধু আমাদের জীবন কেন, আমাদের সন্তানদের জীবনেও ত্যাগ করতে হবে, ভবিষ্যতের অনেক বছর পর্যন্ত আমাদের শুধু পরিশ্রম করতে হবে, অভাব-জীবনের অশ্রু ফেলেই যেতে হবে। সুতরাং সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখে লাভ? সেদিন বেশ শান্তভাবেই সাবিত্রী প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিটি পাঠ করেছিল। তারপর কি হল, হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ল সে। হাতের কাছে ছিল জলের জগ।

দূর ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে-জগটি। সোজা এসে লাগল আমার কপালে। যে কাটা লাল দাগটা দেখছেন আমার কপালে, এটি সেই আঘাতেরই ফল। সাবিত্রীর সস্তা সাড়ীতেও এ-রকম মেলা কাটা-দাগ আছে। আপনার চোখে সে-গুলো ঠিক পড়বে না। কিন্তু আমি সে-গুলো বেশ দেখতে পাই। ওর ইচ্ছে হয়েছিল জাফরান্ রংএর মাকড়সার জালের মত পাতলা একখানা সাড়ী কেন্‌বার। সেই আকাশ-ছোঁওয়া দামের সাড়ী কিনতে-না-পারার ব্যথার কাটা দাগ থেকে গেছে সাবিত্রীর মনে। আমাদের ছোট্ট বাচ্চাটি একবার আবদার ধরেছিল একটি সুন্দর খেলনার। কিন্তু আমাদের নাগালের বাইরে দামের জন্য তাকে সে-খেলনা কিনে দিতে পারি নি। খেলনা না পেয়ে ছেলের সে কি কান্না! সে-কান্না যেন আর শেষ হয় না, যেন বুক ফেটে মরেই যাবে। মায়ের মনে ছেলেকে খেলনা না-দিতে-পারার ব্যাথা কেটে বসে আছে। সাবিত্রীর মনে আবার এক গভীর ক্ষত হয়েছিল যেদিন মৃত্যুশয্যায় মায়ের শেষ দেখার ইচ্ছা পূরণ করতে বাপের বাড়ীর দেশে জব্বলপুরে সে যেতে পারে নি। টেলিগ্রাম ছুটে এল দুঃসংবাদ নিয়ে, কিন্তু মেয়ে ছুটে যেতে পারল না মাকে দেখতে। রেল-ভাড়ার টাকা জোগাড় করবে কোথেকে আমার মত কেরানী! প্রাণের কন্যা সাবিত্রীকে শেষ-দেখা দেখে যেতে পারল না তার বুড়ী মা।...কিন্তু সাবিত্রীর সস্তা সাড়ীর গায়ে জমে-ওঠা এত ক্ষতের হিসেব কষে দেখছি কেন আমি? এত অগুন্তি ক্ষত চিহ্ন তো সাবান ঘসে মুছে দেওয়া যাবেনা —বর্তমানের এই সস্তা ছেঁড়া সাড়ীটি ছেড়ে সাবিত্রী যখন আবার আর একটা সওয়া পাঁচ টাকার সাড়ী কিনবে, তখনও এই ক্ষতচিহ্ন গুলো ঐ

নতুন-কেনা সাড়ীর গায়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে থাকবে। কি উপায়ে সেগুলো নতুন-সাড়ীর গায়ে ফুটে থাকে, আমি ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্তু দেখেছি সেগুলো সাবিত্রীর নতুন সাড়ীতে ফুটে থাকে।

ঐ যে চতুর্থ সাড়ীটি দেখছেন, সিঁদুরে রংএর, বলতে কি, আমার কাছে ওটারও রং মনে হয় পাটকিলে। এসব সাড়ীগুলোর প্রত্যেকটিরই আলাদা আলাদা রং আছে বটে, তবে আমার কাছে সবগুলোই কেমন যেন ভ্যাবড়েবে উজ্জ্বলাহীন এবং একই রকম ঠেকে। এই পাটকিলে রংএর সর্ব-বিস্তৃতির কাছে অন্য রংগুলো সব যেন ডুবে যায়। ব্যাপ্তির মাঝে ক্ষুদ্রের সৌন্দর্য···উষাবসানের বিস্তৃতির মাঝে শিশির-ভেজা গোলাপের পাঁপড়ী, আকাশের মেঘের কোণে সপ্তরঙ্গী রামধনুর বর্ণালী, গোধূলির সমুদ্রে অস্তগামী সূর্যের সোনালী চ্ছটা! সব কিছুকে টেনে একাসনে একাকার ক'রে মিশিয়ে দেওয়া! প্রতিহিংসা চরিতার্থতার হর্ষোল্লাস কণ্ঠে যেন ঘোষণা উঠছে: এই দেখ, হির হির ক'রে সকলকে টেনে এক সঙ্গে কেমন দাঁড় করিয়ে দিয়েছি···যুবতী শান্তা, মধ্যম বর্ষীয়া সাবিত্রী, বৃদ্ধা জীবন বাই—সকলকে টাকা-আনা-পাইয়ের অঙ্কের হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি···দাম কতো গো···সওয়া-পাঁচ-টাকা!

যে-কথা বলছিলাম···সিঁদুরে-পাটকিলে রংএর সাড়ীটি। ও সাড়ীটি হ'ল লাতারিয়ার। ঝাবুর স্ত্রী লাতারিয়া। নিঃসন্তান লাতারিয়া···সুতরাং লাতারিয়া ডাইনী। আমার স্ত্রী ওর সঙ্গে কথা বলে না। কারণ, তার

ধারণা, ছোট ছোট শিশুদের ওপরে লাতারিয়া ডাইনী-বিদ্যা প্রয়োগ করে। বস্তির মেয়েরা বিশ্বাস করে যে গত বছরে আমাদের বস্তিতে যে এত শিশু মারা গেল—আমার ছোট মেয়েটিও মারা গিয়েছিল, এবং প্রতি বছরই এই হারে বস্তির শিশু মরে থাকে—তার পিছনে ছিল ডাইনী লাতারিয়ার যাদুবিদ্যা। আমার স্ত্রীর এই স্থির-বিশ্বাসকে তর্ক ক'রে আমি ভাঙতে পারি নি। লাতারিয়াকে সে দেখতে পারে না তার যাদুবিদ্যার জন্যও বটে আর ঝাবুর সঙ্গে তার যথারীতি বিয়ে হয় নি বলেও বটে। ঝাবু বলে তাকে কিনে এনেছিল। এককালে মোরাদাবাদে বাস করত ঝাবু। সেই বাচ্চা বয়সেই মোরাদাবাদ ছেড়ে সে হাজির হয়েছিল বোম্বাই শহরে। তার মাতৃভাষা হিন্দী ছাড়াও সে বেশ সুন্দর কথা বলতে পারে মারাঠী ও গুজরাটী ভাষায়। বহুদিন বোম্বের রাস্তায় সে দিনাতিপাত করেছে। তারপর সে পাওয়ার-মিলের গানি ব্যাগ ডিপার্টমেণ্টে একটি কাজ পেয়ে গেল। যুবা বয়স থেকে ঝাবুর একমাত্র বাসনা ছিল বিয়ে করার। কোন নেশা ছিল না তার। ধূমপান কিংবা তাড়ি—কোনটাই তার চলত না। শুধু বিয়ের বাসনা, আর কিছু নয়। আস্তে আস্তে সে আশীটী টাকা জমালো বিয়ের জন্য। মোরাদাবাদে গিয়ে তার নিজের দেশের নিজের সমাজের একটি মেয়েকে সে বিয়ে করবে। কিন্তু টাকা তো মোটে আশীটি। মোরাদাবাদে যাতায়াতের খরচও তো কুলবে না এই টাকায়। কোন মতে গিয়ে পৌছন যায়, কিন্তু নিজ সমাজে বিয়ে তো করা যাবে না এত অল্প টাকায়। বহু চিন্তাভাবনা ক'রে সে একটা পথ খুজে বার করল। মেয়ে কেনা-বেচার ব্যবসা করে

এমন একটি লোকের খোঁজ ক'রে তার সঙ্গে দেখা করল ঝাবু। একশ টাকা দিয়ে সে কিনল লাতারিয়াকে। নগদ দিল আশী টাকা, আর বাকী :কুড়ি টাকা শোধ করল সে দশ মাস ধরে।

লাতারিয়াকে নিয়ে ঝাবু সুখীই হলো। জানতে পারল লাতারিয়াও সেই মোরাদাবাদের মেয়ে, তারই সম-সমাজের। ভাল গান জানে লাতারিয়া। দিনের বেলায় ঝাবু কলে খাটতে গেলে দিন ভোর একা একা গান গায় লাতারিয়া। ঝাবু ফিরে এলে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তারা গায় দুজনে। কিন্তু নিঃসন্তান তারা। লাতারিয়ার জন্য ঝাবু কিনে আনল একটি টিয়ে পাখী। একটি ইংরেজ সৈনিকের পোষা পাখী ছিল টিয়েটি। চোস্ত ইংরেজী গালের বুলি তার ঠোঁটে। গভীর রাত পর্যন্ত লাতারিয়া গাইত, ঝাবু গাইত, আর টিয়েটি চিৎকার ক'রে আওড়াতো সেই সব ইংরেজী গালাগাল। যেন লাউডস্পিকার ফিট করা আছে ঝাবুর ঘরে।

কোনরকম পানদোষ ছিল না ঝাবুর—না ধূমপান, না মদ্যপান। কিন্তু লাতারিয়া ছিল ঠিক উল্টো। এই দুই পানেই সে ছিল ওস্তাদ। মাতাল অবস্থায় সময় সময় লাতারিয়া মারমুখো হয়ে ঝাপিয়ে পড়তো ঝাবুর ওপরে। রাগে বেসামাল হয়ে ঝাবু দিত আচ্ছা ক'রে উত্তম মধ্যম বসিয়ে লাতারিয়াকে। এবং সেই সময়ে টিয়ে পাখীটিও লাতারিয়ার পক্ষ নিয়ে সুরু করত অকথ্য ভাষায় অশ্রাব্য বুলি আওড়াতে। একদিন এমনি স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের মধ্যে যখন পোষা টিয়ে সুরু করেছে অশ্রাব্য বুলি বর্ষণ, ঝাবু লাতারিয়াকে ছেড়ে দিয়ে খাঁচশুদ্ধ পাখীটিকে নিয়ে ছুটল নর্দমার ময়লা জলে ডুবিয়ে মারতে। অনেক কষ্টে লাতারিয়া সে-যাত্রা পাখীটিকে

বাঁচিয়ে ছিল। আর, ঝাবুও ধর্মভীরু লোক। তারও মনে খটকা লেগেছিল পাখীটিকে এভাবে যদি ডুবিয়ে মারে তো তাকে আবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে, তার আত্মার জন্য শাস্ত্রপাঠ করাতে হবে—আবার টাকা কুড়ি খরচ। সুতরাং টিয়েটাকে আর ডুবান হ'লো না।

প্রথম দিকে লাতারিয়াকে কিন্তু বিশ্বাস করতো না ঝাবু। তাদের এই বিয়ের ব্যাপারটায় বস্তির বৃদ্ধরা ও গোড়া মজুররা বিশেষ খুশি হয় নি। লাতারিয়ার দিকে বেশ একটু সন্দেহই পোষণ করত ঝাবু। সামান্য ত্রুটি পেলে বেশ কয়েক ঘা দিত বসিয়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে লাতারিয়া ঝাবুর বিশ্বাস অর্জন করল। স্বামীকে সে বুঝাল যে ময়দার বস্তার মত কোন মেয়েই কেনা-বেচার পণ্য হয়ে থাকতে চায় না। সে চায় ছোট্ট একটি গৃহ, ছোট্ট একটি সংসার, স্বামী—ঝাবুর মত নির্দয় দাম্ভিক হলেও লাতারিয়া স্বামী চায়, চায় শিশু। রোগা-পটকা হোক, সাবিত্রীর ছেলেমেয়ের মত কুৎসিত হোক, তবু তার সন্তান চাই। লাতারিয়া স্বামী পেয়েছে, সংসার পেয়েছে। ভবিষ্যতে ভগবান নিশ্চয়ই দয়া করবেন, তারও কোলে শিশু আসবে। আর যদি তার গর্ভে সন্তান না আসে? এই টিয়ে পাখীটিকেই নিজের সন্তান হিসেবে পালন করবে লাতারিয়া।

একদিন লাতারিয়া গান গাইছে আর টিয়েকে খাওয়াচ্ছে, এমন সময় বাইরে একটা গোলমালের শব্দ এল তার কানে। মুখ বাড়িয়ে দেখে আহত ঝাবুকে বহন ক'রে নিয়ে আসছে একজন মিল মজুর। ছুটে যায়

লাতারিয়া, নিজেই বহন ক'রে ঘরে নিয়ে আসে ঝাবুকে। শুনল মিলের ম্যানেজারের সঙ্গে ঝাবুর ঝগড়া হয়েছিল। ঝাবুর কাজে ম্যানেজার খুঁত বের করলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ঝাবু শুনল ম্যানেজারের গালাগাল। নীরব ঝাবুর গালে তখন কষে এক চড় বসিয়ে দেয় ম্যানেজার সাহেব। ঝাবু আর পারে না মেজাজ ঠিক রাখতে। ম্যানেজারকে ধরে বেশ কিছু বসিয়ে দেয়। প্রহারটা বলে একটু বেশীই হয়েছিল। সাহেব তখন চিৎকার করতে থাকে: 'হেল্প হেল্প, বাঁচাও বাঁচাও।' তখন ছুটে আসে মিলের ভাড়াটে গুণ্ডারা, ঝাপিয়ে পড়ে ঝাবুর ওপরে। মাথা ভেঙ্গে দেয়। তবে মারা যায় নি ঝাবু। লাতারিয়াও তো নিজের চোখেই দেখছে যে ঝাবু বেঁচে আছে। লাতারিয়ার নতুন জীবন স্থরু হ'লো··· সব্‌জি বিক্রেত্রীর জীবন। দৈনিক আয় উঠতো মোটামুটি। সংসার খরচা টায়ে টায়ে চালিয়ে স্বামীর চিকিৎসার ব্যয় হতো কোনমতে। ঝাবু উঠল ভাল হয়ে। কিন্তু ইতিমধ্যে সব কাপড়েব কলেব ত্রিসীমানায় ঝাবুর প্রবেশ-নিষেধের নোটিশ পড়ে গেছে। মিল মালিক সঙ্ঘের কাল-তালিকায় তার নাম উঠে গেছে। দিন ভর ঝাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে আকাশের গায়ে সেঞ্চুন মিলের লম্বা চিমনি, দেখে উষা মিল, পুরানা মিল, নতুন চিনা মিল, রাজশ্রীর মিলের চিমনির ধূম্র-উদ্‌গিরণ। কিন্তু ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ঝাবুর কোন মিলে! মিল ম্যানেজারের হাতে মিল মজুরের মার খাবার অধিকার আছে বটে কিন্তু মেজাজ হারিয়ে তাকে উল্টো মেরে প্রতিশোধ নেবার অধিকার তো মজুরের নেই! আজকাল লাতারিয়া মন্তপান ছেড়ে দিয়েছে। সে-মেজাজও আর নেই, গালাগালিও করে না।

সব্‌জি বিক্রীর প্রতিটি পাই পয়সা সে বাঁচায় সংসার চালাবার জন্য। তার সিঁদুরে সাড়ী ছিঁড়ে ছিঁড়ে শতছিন্ন হবার মুখে। ঝাবু যদি সত্যি সত্যিই কোন কাজ জোগাড় না করতে পারে, তবে লাতারিয়ার জীর্ণ সাড়ীর গায়ে পড়তে সুরু করেছে বিচিত্র রংএর তালি। টিয়ে পাখীটারও কপাল ভাঙ্গবে—তারও খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। আর, এ-ছাড়া রাস্তাইবা কোথায়!

•

এবারে দেখুন পঞ্চম সাড়ীটি। একটু ড্যাবডেবে লাল রং সাড়ীটির, নীল পাড় বসান। দূর থেকে মনে হয় সাড়ীটা ন্যাকড়াটে হয়ে গেছে, যদিও সাড়ীটি ভাল ও দামী। পাড়টি উজ্জ্বল বর্ণের। দাম সওয়া পাঁচ টাকা নয়, পৌনে নয় টাকা। মনজুলার সাড়ী। যুবতী মনজুলা, সেদিন বিধবা হয়েছে সে। এই সাড়ী পরেই ছয় মাস আগে তার বিয়ে হয়েছিল। ষোল বছরের নববধূ। ভারী সুন্দর, খুবই কম বয়স। হিন্দু বিধবা, আর তো তার বিয়ে হবে না। গতমাসে কারখানায় এক দুর্ঘটনায় হাড়গোড় ভেঙ্গে তার স্বামী মারা গেছে। একটা মেসিনের ঝুল চামড়ার বেল্টে হঠাৎ জড়িয়ে গিয়েছিল মনজুলার স্বামী। মনজুলার যুবক স্বামীর নিজের দোষেই বলে এই অপমৃত্যু ঘটেছিল, সুতরাং মিল মালিক মনজুলাকে কোনরকম ক্ষতিপূরণ দিতে পারে না। হ্যাঁ, এইসব চামড়ার বেল্টের আবরণ থাকার কথা আছে বটে। কিন্তু, তাতে তো অনেক টাকা লাগবে। একজন নতুন শ্রমিককে কাজে নিয়ে নিলেই হবে, কিন্তু বেল্টের ঢাকনী এখন বসান

যায় না। শ্রমিকদের বেল্ট-ঢাকনীর দাবী উপেক্ষা করেছিল মিল মালিক। মিলের একটি বেল্ট-ঢাকনী পরিবর্তনের জন্য একটি যুবকের অমূল্য জীবন বলি দিতে হয়। যে কোন ছোটখাট সামান্য পরিবর্তন সাধনের জন্য মানুষের শোণিত বয়ে যায় এই ভাবেই।

স্বামীর মৃত্যুর পর ক্ষতিপূরণ দাবী ক'রেছিল মনজুলা। কিছুই পায়নি সে। হিন্দু বিধবার সাদা থান কেনার সামর্থও ছিল না তার। সুতরাং বিয়ের রাতের সেই কনে-সাজের সাড়ীই পরে থাকতে হয় বিধবা মনজুলাকে। সেই কনে-সাজের চেলি, নীল পাড় বসান সাড়ী— হিন্দু বিধবাদের যে-সাড়ী ব্যবহার নিষিদ্ধ।

তবে মনজুলা পৌনে নয় টাকার সাড়ী আর পরবে না। স্বামী বেঁচে থাকলেও পরতো না। পরতে হতো সেই সওয়া পাঁচ টাকা দামের সাড়ী, যা তার নিজেকেও কিনতে হবে ঐ দামেই। সুতরাং এই দিক থেকে তার জীবনে বিশেষ কোন পরিবর্তন নেই। শুধু এই বিয়ের রাতের কনে-সাজের এই চেলি আর সে কিনেও কোনদিন পরতে পারবে না। মনজুলাকে এই সাড়ী বারে বারে মনে করিয়ে দেয় তার যুবক স্বামীর কথা। তার সুদৃঢ় সুবিশাল বাহু, উষ্ণ আলিঙ্গন, প্রেম কূজন···মনজুলার কাঁধে-পিঠে যুবক স্বামীর তপ্ত নিঃশ্বাস···নিদ্রালু পরিবেশের মাঝে আনন্দমুখর দেহে সুপ্তির কোলে ঢুলে পড়া···। শুধু একটি সাড়ী নয়। সে-স্মৃতি মনজুলার সর্বদেহে লেপটে জড়িয়ে থাকে সর্ব সময়ে খৃষ্টানদের ক্রস চিহ্নের মত। যুবতী মনজুলার প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর কালো ছায়ার স্পর্শ ফুটে থাকে। ইচ্ছে করলেও মুছে ফেলে দিতে পারে না।

ষষ্ঠ এবং শেষ সাড়ীটি যে ঝুলছে পুলের রেলিংএ তার রংটি গভীর লাল। কিন্তু ওটাতো ওখানে শুকোতে দেওয়ার কথা নয়। কারণ, সাড়ীর যে মালিক, সে তো মারা গেছে। কিন্তু তবুও সেটা ঝুলছে··· আমি দেখতে পাচ্ছি···ধোওয়া ভিজে সাড়ী, একটা লাল পতাকার মত বাতাসে যেন উড়ছে।

এ সাড়ীটি হ'ল বৃদ্ধা মা'র। বস্তির সামনের গেটের পাশে উন্মুক্ত উঠানে সে বাস করতো! আবর্জনা-জঞ্জাল ঝেটিয়ে ফেলে বস্তি পরিষ্কার রাখত সে। মার ছেলে সীতুও ছিল ধাঙ্গড়। তার পুত্রবধু ও ছোট্ট নাতিও তাই। ঝাঁটা, ময়লা-ফেলা ক্যানেস্তারা, বালতি—এই সব নিয়েই সব ধাঙ্গড়ের মেয়েদের মতই তারা বাস করতো ঐ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। অচ্ছুৎ—পৃথিবীর আবর্জনা। বস্তির ঘরে তাদের স্থান হতে পারে না। সুতরাং বাইরেই তারা থাকে, খোলা আকাশের নীচেই তাদের বাস, কঠিন শক্ত প্রাঙ্গণের ওপরেই তারা নিদ্রা যায়। ঐ গেটের পাশেই বৃদ্ধা ধাঙ্গড়নী মারা গিয়েছিল। ঐ লাল সাড়ীটাতে একটি ছেঁদা দেখছেন? হ্যাঁ, ঐখানেই গত ধাঙ্গড়-ধর্মঘটের সময় গুলি বিঁধেছিল। না, বৃদ্ধা ধর্মঘটে ছিল না। ঐ বয়সে আর ধর্মঘটে কেউ যোগ দিতে পারে না। তার ছেলে ধর্মঘটে ছিল। শুধু থাকা নয়, সে ছিল ধর্মঘটিদের নেতা। মজুরী বৃদ্ধির দাবীর ওপর ছিল ধর্মঘট। শহরের অধিকর্তারা সে-ধর্মঘটকে বে-আইনী ঘোষণা করল। কিন্তু ধাঙ্গড়রা কি আর তাতে মাথা নোয়ায়! তারা মিছিল বের ক'রে শহরের অলিগলি ঘুরে ইনকিলাবি আওয়াজ ও তাদের

দাবীর কথা চিৎকার ক'রে শোনাতে থাকে নাগরিকদের। আমাদের বস্তির কাছে যখন তারা এসে পৌছল, ঐ সঙ্ঘবদ্ধ জনতাকে বে-আইনী ঘোষণা ক'রে হুকুম এল মিছিল ভেঙ্গে দিয়ে সরে পড়ার। কিন্তু সে-মিছিল আপনা থেকে ভাঙ্গল না। সুরু হলো গুলি বর্ষণ। হ্যাঁ, ঐখানে, আমাদের বস্তির ঠিক বাইরে ঐ জায়গায়ই এই গুলি বর্ষণ হয়েছিল। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে ভয়ে কাঠ হয়ে প্রায় জড়াজড়ি অবস্থায় আমরা ঘরে বসে বসে বাইরের গুলি বর্ষণের শব্দ শুনি। এক এক পশলা বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই দাবীর আওয়াজ ওঠে। তারপরেই শুনি এক জনের চিৎকার··· আর একজনের···আর এক জনের। তারপরেই সব চুপচাপ—নিথর নিস্তব্ধতা। একটি টু শব্দও দেই কোথাও। আস্তে আস্তে দরজা খুলে অতি সাবধানে চারদিকে তাকাতে তাকাতে আমরা বেরিয়ে আসি। হ্যাঁ, মিছিল ভেঙ্গে দিয়েছে। গেটের পাশে বৃদ্ধা মা মরে পড়ে আছে। তারই সাড়ী ওখানা। ধাঙ্গড় ধর্মঘটের নেতা তার ছেলে সীতুকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেছে। সে এখন জেলে। বৃদ্ধা মার সাড়ীটি এখন ব্যবহার করছে তার পুত্রবধূ। বৃদ্ধার শবের সঙ্গে এ সাড়ীটিও পুড়িয়ে ফেলতে পারত তারা···লোকে বলে এতে ক'রে বলে মৃতের প্রতি সম্মান দেখানো হয়। কিন্তু এই ধাঙড়রা সত্যিই অদ্ভুত নতুন জীব। তারা বলে, মরে যে গেল, সে তো চলেই গেল। বেঁচে যে আছে তাকেই সম্মান দেখাও। সাড়ী পুড়িয়ে না ফেলে ব্যবহার কর। পুড়োবার জন্য তো সাড়ী নয়, সাড়ী তো ব্যবহারের। তাই সীতুর বৌ মৃতা শ্বাশুড়ীর সাড়ী ব্যবহার করে। কিন্তু সীতুর বৌও মাঝে মাঝে হঠাৎ গম্ভীর বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

বৃদ্ধার জন্য ব্যথায় বেদনায় মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। দু' আঁখি বেয়ে অশ্রু নামে। বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীর ব্যবহার-করা সাড়ীর আঁচল তুলে সে-অশ্রু সে মুছে ফেলে···বৃদ্ধার দৈনন্দিন জীবনের কত তিক্ত সংগ্রাম বিজড়িত এই সাড়ী, তার সুদীর্ঘ জীবনের কত অভিজ্ঞতার পরশ মাখানো সাড়ী। আঁখি মুছে সীতুর বৌ ঝাঁটা তুলে নিয়ে আবার জঞ্জাল ঝাঁট দিতে সুরু করে, যেন তার এই ঝাঁট-দেওয়া কেউই বন্ধ করতে পারবে না। লাঠি, গুলি, জেল—কিছুই পারবে না তার সম্মার্জনীর গতি রুদ্ধ করতে। দুনিয়ায় সমস্ত আবর্জনা যেন সে ঝেঁটিয়ে দূর ক'রে দেবে। শক্তিশালী সম্মার্জনী। হ্যাঁ, অত্যন্ত শক্তিশালী···

* * *

ওঃ···! আমি দুঃখীত।

আমাদের প্রধান মন্ত্রীর স্পেশাল ট্রেন যে যাচ্ছে···

ভেবেছিলাম, আমাদের এই প্লাটফরমে তিনি হয় তো এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াবেন, মহালক্ষ্মীর পুলের রেলিংএর এই ছয়টি সাড়ীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখবেন। আমাদের অতি সাধারণ ঘরের মেয়েদের সাড়ী ওগুলো···লক্ষ লক্ষ সাধারণ মেয়ে বৌ যাদের কেন্দ্র ক'রে লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট সংসার গড়ে ওঠে। ছোট ছোট সংসার···ছোট ঘর···ঘরের একোণে উনুন, ওকোণে জলের কলসী, অতি ছোট্ট জানালার ওপরে একটি ক্ষুদ্র আরশি, একটি কাঁকই, তারই পাশে ছোট্ট একটি সিঁদুরের কৌটো। আর এক কোণে শিশু ঘুমিয়ে। এ-বেড়া ও-বেড়ায় টানা-দেওয়া দড়ির ওপর গৃহিনীর শুকোতে-দেওয়া তার ছোট সংসারের যত

কাপড় কাঁথা সাড়ী। এই সব জীর্ণ সাড়ী সেই সব লক্ষ লক্ষ গৃহিনীদের যাদের ছোট ছোট সংসারের সম্মিলিত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে আমাদের মহান দেশ 'ভারতবর্ষ'। আমাদের শিশুসন্তানদের মা তারা, আমাদেরই প্রিয় ভাইদের বোন এরা। আমাদের কত বীর-গাথা ও প্রেম-কাহিনীর নায়িকা তারা। আমাদের পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহ্যপূর্ণ মহান সভ্যতার পতাকাবাহি। প্রধান মন্ত্রী মহোদয়! আমাদের দেশের অতি সাধারণ মেয়েদের এই ছয়টি সাড়ী আপনাকে কিছু বলতে চায়। অতি সামান্য কিছুর জন্য আবেদন জানাতে চায় তারা আপনার কাছে। না, না, খুব বেশী কিছু তারা চায় না। জমিজমা, বৃহৎ আফিস, মোটর গাড়ী, পারমিট কিংবা সুন্দর সাজানো বাংলো তৈরী করার আবেদন তারা করবে না। এসবের কথা তারা মোটে ভাবেও না। তাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি সামান্য জিনিসের কথাই শুধু তারা আপনাকে বলতে চায়। ঐ যে শান্তার সাড়ী দেখছেন। শান্তার মনে ক্ষোভ জমে আছে তার বাল্য-কালের সেই রামধনু রংএর সাড়ীর জন্য। জীবন বাই ফিরে পেতে চায় তার চোখের দৃষ্টি, তার মেয়ের সম্মান। সাবিত্রীর সাড়ী···সাবিত্রীর সেই সুখকল্পনা, তার ছেলেমেয়ের স্কুলের মাইনের ব্যবস্থা সে চায়। লাতারিয়ার জীর্ণ সাড়ী···লাতারিয়ার স্বামী বেকার, তার টিয়ে পাখীটাও দুদিন হল অভুক্ত। তারপর মনজুলার সাড়ী···যুবতী সদ্যবিধবা মনজুলা। তার মনে শুধু একটি প্রশ্ন : তার স্বামীর জীবন থেকেও কি মিল মালিকের মেসিনের একটি বেল্টের ঢাকনীর দাম বেশী? তারপরের সাড়ীটি হ'ল বৃদ্ধা মা'র। সে শুধু চেয়েছিল যে বুলেটের বদলে লাঙ্গলের

ফলা তৈরী করুক মন্ত্রী মহাশয়...ধরার বুকে হেসে উঠুক সোনালী ফসল !

কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর স্পেশাল ট্রেন তো আমাদের এই মহালক্ষ্মীর পুলে দাঁড়ালো না। তিনি তো দেখতে পেলেন না, শুনলেন না এই ছয়টি সাড়ীর করুণ কাহিনী ! সুতরাং তোমার কাছেই আমি এই সাড়ীগুলোর ইতিবৃত্ত নিয়ে দাঁড়াই। হ্যাঁ বন্ধু, তোমার কাছেই...তুমি যে আমার ভাইয়ের থেকেও ভাই, পড়শী থেকেও পড়শী, তোমার কাছেই আমি অনুরোধ করছি মহালক্ষ্মীর পুলের বাঁ পাশের রেলিংএর এই সাড়ী ছয়টির দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। তুমি আরও একটু ঘুরে দেখ এই মহালক্ষ্মীর পুলেরই দক্ষিণ ধারের ঐ রেশমী সাড়ীগুলোকে। ধনী গৃহিনীদের সাড়ী ধোপারা কেচে শুকোতে দিয়েছে। বড় বড় মিলের মালিক, গুদামের মালিক, সীমাহীন মুনাফা লুটের দায়-বদ্ধ কোম্পানীর মালিক-পরিবারের রেশমী সাড়ী এগুলো। তাকিয়ে দেখ একবার দক্ষিণে, আর একবার বামে, তারপর ঠিক কর তুমি কোন্ দিকে। না, না, তোমাকে আমি কমিউনিস্ট হ'তে বলছি না, শ্রেণী-সংগ্রামেও বিশ্বাসী হতে বলছি না। তোমার কাছে শুধু আমার একটি মাত্র প্রশ্ন : তুমি কোন দিকে : মহালক্ষ্মীর পুলের দক্ষিণে, না, বাঁয়ে ?

ফুলের রং লাল

রোজই ওকে মিলের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখি। বছর বারো বয়স, মুখে বসন্তের দাগ, রোগা, কালো ছেলেটি। রোজই ও মিলের সামনে দিয়ে হেঁটে যায়। সকালবেলা হাজিরা ডাকার সময়ে, বিকেল বেলা জলখাবার খাওয়ার সময়ে, সন্ধ্যেবেলা মিল থেকে বাড়ি ফেরবার সময়ে ওকে আমি দেখি। চাকরির খোঁজে ও এখানে আসে না কারণ ও অন্ধ। আর এই দেশে চক্ষুষ্মান লোকেরাও চাকরি পায় না, অন্ধদের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্। অন্ধদের পক্ষে সব চেয়ে উপযুক্ত জীবিকা হল ভিক্ষে করা।

কিন্তু এই ছেলেটি বেশ চালাকচতুর। ওকে আমি কখনো ভিক্ষে করতে দেখিনি। ওর গলার স্বর সরু কিন্তু চমৎকার গাইয়ে-গলা। হাতে সব সময়ে এক তাড়া গানের বই আর মিলের সামনে দাঁড়িয়ে এই বইগুলো ও এক-এক আনা দামে বিক্রি করে। বই বিক্রি করবার সময়ে নতুন নতুন সিনেমার গান গেয়ে শোনায়; এই গানগুলো মিলের মজুরদের খুবই প্রিয়।

আমি সিনেমা দেখতে ভালবাসি। প্রত্যেকেই ভালবাসে। প্রথমতঃ, সারা দিন এমন হাড়ভাঙা খাটুনি যে সারা গা ব্যথায় টন টন করে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মাইনে এত কম যে কোন দিকেই কুলিয়ে ওঠা যায় না। দিনের পর দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবার মত সামর্থ্য আমাদের নেই। কাজে কাজেই প্রত্যেকেই চায় তাড়ি গিলতে বা সিনেমায় যেতে। আমি তাড়ি ছুঁই না, কিন্তু সিনেমায় যে যাই তা অস্বীকার করি না। সিনেমায় দেখি, মেয়ে এবং পুরুষ চটকদার বেশভূষা পরে গাড়ি চেপে ঘুরে বেড়ায় আর প্রেমে পড়ে। সেখানে সবাই দিবারাত্রি প্রেম করে বেড়াচ্ছে। যাকেই দেখা যাক্ না কেন, হয় সে প্রেমে পড়েছে বা পড়তে যাচ্ছে বা প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে ভাবি, এই লোকগুলো কাজ করে কখন, কখনই বা এরা মিলে যাবার সময় পায় আর এই মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে এমন ফুরফুরে জামাকাপড়ই বা এরা পায় কি করে! আর এমন বাবুয়ানি চালে দিন কাটাবার টাকা এদের আসে কোথা থেকে সে হিসেবও আমার মাথায় ঢোকে না। আমরা তো সাত জন্ম চেষ্টা করেও এত টাকা জমাতে পারব না।

এ ছাড়া কথা আছে। সিনেমায় আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি দেখেছি—ধনীরা গরীবদের সঙ্গে প্রেম করে, মালিকের ছেলের প্রেমিকা মজুরের মেয়ে, মালিকের মেয়ে মজুরের ছেলের প্রেমের কাঙ্গালিনী। শেষকালে মালিকরা পর্যন্ত টাকাপয়সার মমতা ত্যাগ করে সমাজসেবী হয়ে যায়। আমার ভারি ইচ্ছে করে কেউ আমাকে বলে দেয় কোথায় গেলে এমন সব মালিক ও মালিক-দুহিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে। বাস্তবে দেখি, ফোরম্যানরা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে কথা বলাটা

মর্যাদা-হানিকর মনে করে। তবুও স্বীকার করতে হবে যে সিনেমা হচ্ছে চমৎকার একটা ফুর্তি—আর সে জন্যে খরচ মাত্র চার আনা।

তাহলেও প্রত্যেকটি সিনেমার বই যে দেখা হয়ে ওঠে তা নয়। এমন প্রায়ই হয় যে ভালো ভালো ছবি এসে চলে গেল কিন্তু চার আনা পয়সা পর্যন্ত নেই। যতবার এরকম হয় আমরা অন্ধ ছেলেটির কাছ থেকে ছবির বইটা কিনে নিই, ওর মুখে গানগুলো শুনি আর তারপর গুন গুন করে নিজেরাই গাইতে থাকি। এক আনায় এই বা মন্দ কি।

আমাদের জীবনে এত বেশি শূন্যতা যে যখনই এতটুকু আশার আলো আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ঝিলিক্ দিয়ে বেরিয়ে যায় আমরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি : এই আশার আলো কোনদিন কি আমাদের কাছে ধরা দেবে না? এমন দিন কি আসবে না যেদিন এ মধুর ঝিলিক্-টুকু আমাদের কুটিরপ্রাঙ্গণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে? এই প্রাণোচ্ছল সুর আমাদের জীবনের গান হয়ে বেজে উঠবে কবে? কাজ করতে করতে এই সব কথা আমরা ভাবি আর স্বপ্নের জাল বুনি। ফোর্ম্যান এসে গালাগালি দেয় আর ভেঙে চুরমার হয়ে যায় আমাদের স্বপ্ন, কল্পনার সেই সুন্দর জাল ভাঁজ হয়ে হয়ে কোথায় অদৃশ্য হয় যেন—আমাদের স্বপ্ন ও মনপ্রাণ চিরদিনের মতই আবার নিরাবরণ হয়ে পড়ে।

আর এই জন্যেই একদিন আমরা হরতাল করে বসলাম। লাল ঝাণ্ডার লোকেরা আগেও কয়েকবার এসেছিল কিন্তু আমি ওদের ইউনিয়নে এখনো যোগ দিইনি। সারা দিন আমি কাজ করতাম। সন্ধ্যার সময় কোন

কোন দিন যেতাম সিনেমায়, বাড়ি ফিরতাম কোন একটা সিনেমার গান গুন গুন করে গাইতে গাইতে। বাড়ি ফিরে শুকনো রুটি খেতাম আর এই শুকনো রুটি যে আমার কপালে জোটে সেজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুয়ে পড়তাম। ক্রমে একদিন চালডালের দাম হল আকাশছোঁয়া, যে কয়লা আমাদের নিত্য প্রয়োজন তা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল কালোবাজারে। মনে হল যেন আমার মজুরী চারগুণ কমে গেছে।

পেটে সর্বক্ষণ খিদে জ্বলে, ছেলেমেয়েগুলোর পরণে ছেঁড়া জামাকাপড়, ঘরভাড়া পর্যন্ত দিতে পারি না। সিনেমায় যাওয়া ঘুচে গেছে। আগে সিনেমার পুরনো গানগুলো গুন গুন করে গাইতাম, এমনও হয়েছে যে দু-একটা গান মাঝে মাঝে নিজেই বানিয়েছি। ভারি ভালো লাগত। কিন্তু এখন আমার শুকনো ঠোঁটে স্বর বেরোয় না। পুরনো গানও গুন গুন করে গাইতে পারি না, নতুন গানও বানাতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয়, সেই যে সিনেমার মিলমালিকের মেয়ে, যে নাকি একটি মজুরের প্রেমে পড়েছিল, সে যদি এখন আমার সামনে এসে সপ্রেম ভঙ্গিতে দাঁড়ায় তাহলে কী মজাই না হয়। কিন্তু এসব ঘটনা বাস্তব জীবনে ঘটবার জন্যে নয়। আমাদের মিলের মালিকের মেয়ে বাপের সঙ্গে দেখা করতে এসে মোটরে চেপে বেরিয়ে যায়। যেতে যেতেও আমাদের দিকে একটিবারের জন্যেও ফিরে তাকায় না। ওটুকু হলেও বরং আমরা একবার গেয়ে উঠতে পারতাম: 'দো নয়নো মে নয়নো মিলায়!'—এটা একটা সিনেমার গান।

সুতরাং কারখানার মজুররা যেদিন হরতাল করবার জন্য ভোট নিল,

আমিও তাতে যোগ দিলাম। হরতাল করাটা মোটেও একটা আয়াসের ব্যাপার নয়। যে লোকটাকে অনবরত কাজ করতে হয় তাকে হঠাৎ বাধ্য হয়ে কাজ বন্ধ করতে হলে সে স্বস্তি বোধ করে না। হরতাল মানেই পেটে কিল মেরে পড়ে থাকা। আমাদের তো আর ব্যাঙ্কে জমানো টাকা নেই যে হরতালের সময়েও আরামে দিন কাটিয়ে দেব।

সবাই বলে, শ্রমিকদের হরতাল করা উচিত নয়, তাদের আরও বেশি কাজ করা উচিত, আরও বেশি কাপড় বোনা উচিত। আমরা বলি, বহুত আচ্ছা, আমরা আরও বেশি খাটব, আরও বেশি কাপড় বুনব—ওতে আমরা গররাজি নই। কিন্তু যতই আমরা কাপড় বুনি না কেন, কাপড়ের দাম ততই বেড়ে চলে, মিল মালিকদের ভুঁড়িও ততই বাড়তে থাকে আর আমাদের মজুরিও ততই কমতে থাকে। আরে ভাই, আমাদের কথাটাও তো একটু ভাবা দরকার, না কি? আগে আমরা বড় জোর চার আনা পয়সা খরচ করে একটা সিনেমা দেখতাম, এখন তাও আর পারি না। কী করব আমরা!

তাই আমরা হরতাল করলাম আর হরতালও হল জবরদস্ত। হাতে গোনা যায় এমন কয়েকজন পা-চাটা ছাড়া আর কেউ কাজে গেল না। ভারি ফুর্তি হল আমাদের। চারদিকে পুলিস কিন্তু আমরা মিলের আশেপাশে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে খোসগল্পে মত্ত। অন্ধ ছেলেটি আসে, অন্য দিনের মতই গান গায়। কিন্তু ওর বই আর একটিও বিক্রি হয় না। মিষ্টি সুরেলা গলায় সমস্ত মাধুর্য ঢেলে দিয়ে গান গায় ও কিন্তু তবুও পকেট থেকে কেউ একটি আনি বার করে না। জান তো ভাই,

আমরা হরতাল করেছি আর কতদিন এই হরতাল চলবে কেউ বলতে পারে না। একটা আস্ত আনি, চার-চারটে পয়সা। এক আনার জুট্টা কিনলে দুপুরের আর রাত্রের খাওয়া হয়ে যায়।

লোকে যখন বলে যে প্ররোচককারীদের ভাঁওতায় ভুলে শ্রমিকরা হরতাল করে, আমি হাসি। যারা এসব কথা বলে তারা হয়তো জানে না যে মজুররা হরতালের সময়ে মাংস-পোলাও খায় না। শুকনো রুটি চিবোয় আর হাত মুষ্টিবদ্ধ করে কলিজার রক্ত ঢেলে দেয়। এইভাবেই মজুররা হরতাল করে। চোখের সামনে ছেলেমেয়েরা মরে না খেয়ে, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে হয় মেয়ে-বৌ খাবার জন্যে ঘাস সেদ্ধ করছে—আর তখন মাথা নীচু করে দাঁতে দাঁত চেপে তারা গিয়ে দাঁড়ায় মিলের গেটের সামনে। কিন্তু ভিতরে ঢোকে না। দুর্বলতা, লোভ আর শয়তানি বুদ্ধি চায় তাদের ভিতরে ঠেলে দিতে। সত্যি কথা বলতে কি হরতাল করার চেয়ে গুলি খেয়ে মরা অনেক সহজ।

যাক্ এসব কথা। গান গেয়ে গেয়ে ক্লান্ত হয়ে অন্ধ ছেলেটি সামনের পুলের কাছে গিয়ে একটা পোস্টে ঠেস্ দিয়ে গা এলিয়ে দিল। আমি দেখতে পাচ্ছি, ওর মুখের ভাব কাঁদো-কাঁদো। আমাদের মতই মনমরা। আস্তে আস্তে হেঁটে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'কটা বই বিক্রি হল আজ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'একটিও না।'

'এখন আর বই বিক্রি হবে না।'

'কেন ?'

'মিলে হরতাল চলছে, মজুররা কাজে যাচ্ছে না।'

'কেন ? অসুখ-বিসুখ হচ্ছে নাকি ?'

'না, অসুখ নয়। অবশ্য এও এক ধরনের অসুখ বৈকি। খেতে পরতে না পেলে আর মনের শান্তি না থাকলে লোকে কাজ করবে কি করে ?'

শুকনো ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে চেটে ও বলল, 'আজ একটাও বই বিক্রি হল না।'

'আজ মিলে হরতাল চলেছে।' বললাম আমি।

'এব আগে এমনি আর একদিনও একটা বইও বিক্রি করতে পাবিনি॥ সেটি ছিল যে দিনে আমরা নাকি স্বাধীন হয়েছি সেই দিন। আবে বাবা লোকের কি নাচানাচি !'

'কেন, তুমি নাচানাচি করনি ?'

'খিদেয় আমার পেট জ্বলছিল।'

চুপ করে রইলাম। একটু পরে পকেট থেকে একটা আনি বাব কবে দিলাম ওকে। ও ফেরৎ দিল।

'আমি অন্ধ কিন্তু ভিখিরি নই। আমার বাবা এই কারখানাতেই কাজ করতেন। দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান।'

'সে কি, কিসের দুর্ঘটনা ?'

'ফোরম্যানের ভুলে একটা মেসিন তাঁকে থেঁতলে দিয়েছিল।'

'এই আনিটা নাও।' বললাম আমি।

'না, না!' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে শক্তভাবে বসে রইল ও।

আমি চলে এলাম।

রোজই ওকে দেখি। রোজকার মতই ও বই নিয়ে আসে, রোজকার মতই গান গায়। কিন্তু কেউ বই কেনে না। ক্লান্ত হয়ে পড়লে ও পোস্টে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম করে।

আমি ওকে বললাম, 'জান তো এখানে হরতাল চলছে। কাজেই তোমার ওই সিনেমার গান এখন আর কারও ভাল লাগবে না। অন্য কোথাও যাও।'

'কোথায় যাব? অন্য কোন জায়গা আমি চিনি না।'

'ফোর্ট এলাকায় যাও। ওখানে বড়লোকরা থাকে। তোমার বই বিক্রি হবে। আচ্ছা এস, আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ওকে আমি ফোর্ট এলাকায় পৌঁছে দিয়ে এলাম।

কিন্তু পরদিনই ও আবার ফিরে এল।

'ওখানকার লোকেরা সব ইংরেজি বই দেখে। আর দেশী সিনেমার গান ওরা রেডিওতেই শোনে। ওখানে আমার বই বিক্রি হবে না।'

তারপর এল লালঝাণ্ডার লোকেরা। তাদের সঙ্গে এল অন্য সব মিলের মজুর। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমরা হাত নাড়লাম, স্লোগান তুললাম, লড়াইয়ের গান গাইলাম। গান গাইতে গাইতে লক্ষ্য করলাম, অন্ধ ছেলেটি পায়ে পায়ে ভিড়ের দিকে এগিয়ে এসেছে আর সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আস্তে আস্তে গাইছে। সুরটা আয়ত্ত হয়ে যেতেই হঠাৎ ও উৎসাহে গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করে দিল। আমরা ওর সঙ্গে সঙ্গে

গাইলাম। ওর গলায় চমৎকার ঝংকার, যাদু আছে মনে হয়। আমাদের সবারই ভালো লাগে।

গানের শেষে আমরা আবেগের সঙ্গে ওর সুখ্যাতি করলাম। মজুররা ওকে কাঁধে তুলে নিল, তারপর লালঝাণ্ডাটা দিল ওর হাতে, বলল, 'সাবাস ফজলুচাচার বেটা! আমাদের কারখানার ফজ্‌ল-উর-রহমান—ও তারই বেটা যে!'

দেখলাম, অন্ধ ছেলেটির মুখের ওপর দিয়ে সুখের দীপ্ত ঝলক বয়ে গেল।

'গানটা আমার ভারি ভাল লেগেছে।' গভীর আবেগের সঙ্গে বলল ও।

'এই হচ্ছে আমাদের গান।' আমি বললাম।

'ওরা আমার হাতে ঝাণ্ডা দিয়েছিল—নয় কি?' আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আমার বয়স যে এখনো খুব কম।'

'তুমি হচ্ছ শহীদের ছেলে—ফজ্‌ল-উর-রহমান চাচার ছেলে।'

'আমাদের ঝাণ্ডার রং কি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'লাল।'

'লাল রংটা কি রকম?'

বললাম, 'তুমি ঠিক বুঝবে না। তুমি তো আর লাল রং দেখনি। কিন্তু আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি শোন। লাল রংটা হচ্ছে মানুষের কলিজার রঙের মত। মজুরের খাটুনির রং হচ্ছে লাল।'

ঝাণ্ডার ওপরে ও আলতোভাবে হাত বুলোতে লাগল।

'এই রংটা আমি আর কিছুতেই ভুলব না।'

'কি করে?'

'তা আমি বলব না।' বলে ও হাসল। তারপর একটু থেমে আবার বলল, 'বড় জবরদস্ত গান, না? এর পর আমার নিজের গানগুলি আর গাইতে ইচ্ছে করে না। আচ্ছা, এই গানের মত আরও গান আছে?'

চার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে ওকে বললাম, 'কাউকে বলো না—আমিও গান লিখি। কিন্তু আমার লেখা গানগুলি তত ভালো নয়। অন্য কাউকে বলতে লজ্জা করে।'

ও বলল, 'তুমি গান লেখো, আমি সে গান গাইব। এই গানের মত লড়ায়ের গান। লিখবে তো?'

রাত্রিবেলা আমি একটা গান লিখলাম। অপটু হাতের তালমাত্রাহীন গান। লিখতে খুবই কষ্ট হল কিন্তু গানটা আমি লিখলাম হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে। এই গানের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলাম আমার হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা, আমার স্ত্রীর সমস্ত লাঞ্ছনা-নির্যাতন, আমার ছেলেমেয়ের বুভুক্ষা। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা গানের মধ্যে নগ্নরূপে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। আর এই গান নিয়ে আমি গেলাম আমার অন্ধ বন্ধুর কাছে। আর আমাদের এই গানে ও ঢেলে দিল ওর অন্ধ সত্বার সমস্ত অন্তদৃষ্টি, নির্যাতিত আত্মার সমস্ত যন্ত্রণা, তমিস্র অভিযাত্রার সমস্ত আলো। আর তখন গানটা হয়ে উঠল তলোয়ারের মত। তারপর ও যখন গাইল, মনে হল যেন হাজার হাজার কোষমুক্ত তলোয়ার মিলের ফটকের সামনে ঝলসে উঠছে।

যাত্রীদের মুখগুলো বিবর্ণ হয়ে গেল। মজুররা দল বেঁধে এগিয়ে আসতে লাগল মিলের দিকে।

মিলের ম্যানেজার সৈন্যবাহিনী ডাকল।

আমরা বাড়ি ফিরে গেলাম।

এইভাবে অনেক দিন কাটল। আমাদের যা কিছু সঞ্চয় সমস্তই অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে। সমস্ত আশা চুরমার হয়েছে একে একে। কয়েকজন ইতিমধ্যেই কাজে ফিরে যাবার কথা ভাবছে। মিলের মালিক অটল। যারা আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিল তারা শেষকালে আমাদেরই দোষ দিল। খবরের কাগজগুলো 'বড় বড়' লোকের হাতের মুঠোয়, তারাও আমাদের দোষ দিচ্ছে, সাহায্য বলতে কারও কাছ থেকেই কিছু পাচ্ছি না। দারুণ একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে আমাদের দিনরাত্রি কাটছে।

কিছু একটা ফয়সালা হবে বলে মনে হচ্ছে না। তার ওপর আজ অনেকেই কাজে যোগ দেবে ঠিক করেছে।

আমরা ওদের বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেছি কিন্তু কোন কথা শুনতে ওরা রাজি নয়।

আমার ভারি মন খারাপ লাগছে। আমার অন্ধ বন্ধুরও সেই অবস্থা। আস্তে আস্তে হেঁটে আমরা মিলের কাছ থেকে চলে এলাম।

ও বলল, 'কাল থেকে মজুররা কাজে যাবে, না?'

'হ্যাঁ।' অনিচ্ছার সঙ্গে আমি জবাব দিলাম।

'তুমিও যাবে?'

'না

'তাহলে কি করবে তুমি?'

আমি জবাব দিলাম না।

ও বলল, 'ওরা আমার হাতে লালঝাণ্ডা দিয়েছিল।'

এবারেও আমি কোন কথা বললাম না।

একটা ফুলের দোকানের সামনে দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। ও হঠাৎ থেমে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিঃশব্দে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও। তারপর বলল, 'আমি ফুল খুব ভালবাসি। কী চমৎকার গন্ধ! কেউ যদি আমাকে ফুল দিত—অনেক ফুল, রাশি রাশি ফুল!'

'আমার পকেটে পয়সা আছে।' ওর কথার শেষে আমি বললাম।

'তাহলে চল, ওই পয়সায় রুটি কেনা যাক্।'

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজন মিল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। ওর হাতে ঝাণ্ডা, আমার লেখা নতুন গানটি ও গাইছে। এর চেয়ে ভালো গান আগে আর কেনেদিন আমি লিখিনি। আর সেদিন আমরা যেমন চমৎকার গান গাইলাম, তেমন চমৎকারভাবে আর কোন দিন গাইতেও পারিনি। এটা ছিল একটা শেষ ও চূড়ান্ত চেষ্টা। যেন আলোর শেষ রশ্মি অন্ধকারে লীন হয়ে যেতে অস্বীকার করছে। যেন অপরিশেষ শ্রমের ঘর্মবিন্দু গানের নদীতে পরিবর্তিত হয়ে দুর্নিবার ও প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।

কেউ কাজে গেল না। যারাই এসেছে, ডুবে গেছে গানের মধ্যে। মিলের ফটক হাঁ করে খোলা, কিন্তু ভিতরে একটিও লোক নেই।

স্রোতের গতি ঘুরে যেতে দেখে পা-চাটার দল আমাদের দিকে রুখে এল। আমরাও জবাব দিলাম। গুলি চলল। অন্ধ ছেলেটিকে পড়ে যেতে দেখলাম, আর দেখলাম আরেকজন ওর হাত থেকে ঝাণ্ডাটা তুলে নিয়েছে। ছুটে গিয়ে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলাম। ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসে ছুটতে লাগলাম হাসপাতালের দিকে।

হাসপাতালের ডাক্তার সোজাসুজি বলে দিলেন যে ছেলেটি আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। একদল মজুর ঘিরে দাঁড়াল ওর খাটের চারপাশে।

ও জিজ্ঞেস করল, 'কেউ কাজে গেছে ?'

'না।' আমি জবাব দিলাম।

'একজনও নয় ?' ওর গলায় উৎকণ্ঠা।

'না, একজনও নয়।' আশ্বস্ত করলাম ওকে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চাপা স্বরে ও বলল, 'ওরা আমার হাতে ঝাণ্ডা দিয়েছিল।'

প্রবল একটা উচ্ছ্বাসের মত জল এল আমার চোখে। নার্স হাত বুলোচ্ছে ওর মাথায়। অন্ধ ছেলেটির নাসারন্ধ্র কাঁপছে।

'কী চমৎকার গন্ধ! এখানে কেউ বুঝি ফুল এনেছে ?'

ফুলের গন্ধ নয়, নার্স কি একটা সেন্ট ব্যবহার করেছিল। কি যেন বলতে যাচ্ছিল নার্স, আমি বারণ করলাম। তারপর একজন বন্ধুকে চুপিচুপি বলে দিলাম, সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

'এখানে কেউ বুঝি ফুল এনেছে ?' ও আবার জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, 'ফুল এখানে নয়, বাইরে দোকানে। আমি একজন বন্ধুকে পাঠিয়েছি তোমার জন্যে ফুল নিয়ে আসতে।'

ও চুপ করে রইল। বন্ধুটি এক থোকা যুঁই ফুল এনে দিল আমার হাতে। আমি আমার অন্ধ বন্ধুর কাঁপা হাতে ফুলগুলো তুলে দিলাম।

ওর দুর্বল বাদামী হাতের পাশে সাদা যুঁই ফুলগুলো উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে রইল।

'কী চমৎকার ফুল! কী চমৎকার গন্ধ! এই ফুলের রং কি?' বলে ফুলগুলো চেপে ধরল গালের ওপর। হঠাৎ ওর মুখের ওপর দিয়ে একটা সুখের ঝলক বয়ে গেল যেন।

'এই ফুলগুলো লাল, নয় কি? লাল ফুল!' বলল ও। নার্স কি একটা বলবার জন্যে মুখ খুলতেই আমি চোখের ইসারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'ঠিক বলেছ ভাই! ফুলগুলো লাল, টকটকে লাল!'

ও আবার জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের ঝাণ্ডার মত লাল? মানুষের কলিজার রক্তের মত?'

চোখের জল চেপে আমি জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ'।

'ঠিক বলেছ ভাই! এই ফুলগুলো মানুষের রক্তের মত লাল।'

'কী চমৎকার ফুল।' ওর বুকের ভিতর থেকে একটা সুখের দীর্ঘ-নিশ্বাস বেরিয়ে এল, তারপর থেমে থেমে বলতে লাগল, 'কী সুন্দর, কী চমৎকার লাল ফুল! ইচ্ছে হয় এই লাল ফুল দিয়ে নিজেকে ঢেকে

রাখি!...' আর একবার ফুলগুলো চেপে ধরল গালের ওপর, তারপর চোখ বুজল—চিরদিনের জন্যে।

হাসপাতালের কামরায় ফুঁপিয়ে উঠল কে যেন, চোখের জল ফেলল একজন, দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদল আর কেউ।

আজ ও আমাদের মধ্যে নেই। আজ ওর কবরের পাশে গিয়েছিলাম। নোংরা কবর, যত্ন নেবার কেউ নেই। আর আজ যখন কবরের পাশে গিয়েছিলাম, মনে হল যেন ও আমাকে জিজ্ঞেস করছে :

'দাদা! আমার কবরের ওপরে সেই লাল ফুলগুলো কবে ফুটবে?'

আমি ওকে বললাম, 'শোন ভাই! আজ তোমার কথা সবার কাছে বলব। তোমার এই প্রশ্নের জবাব জিজ্ঞেস করব সবার কাছে—তোমাকে এই কথা দিচ্ছি।'

অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত

মৃত মার্কিণ সৈনিকের উদ্দেশ্যে

আমার এই চিঠিটি ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া প্রদেশের সাধারণ সৈনিক কেন্নেথ সাদরিকের কাছে লেখা। কোরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম হত মার্কিন পদাতিক সৈনিক সে। বয়স কুড়ি। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাকে পাঠিয়েছিল কোরিয়ার রণাঙ্গণে।

তার মৃত্যুসংবাদ আমি পড়েছি গতকালের ফ্রি প্রেস বুলেটিন পত্রিকায়। সংবাদটি বিতরণ ক'রেছে জাপানে অবস্থিত মার্কিন সেনাপতি ম্যাকআর্থারের কেন্দ্রিয় অফিস। সংবাদটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক করলাম তাকে উদ্দেশ্য ক'রে আমি একখানা চিঠি লিখব। মৃত সৈনিক সাদরিক...তুমি আমার চিঠি পড়তে পারবে না, আমি জানি। তবুও আমি এই চিঠি লিখছি এই ভেবে, যে, হয়তো এ-চিঠি এমন কারও হাতে পড়বে যে সে এটি পড়ে সাদরিকের জামার ভিতরের দক্ষিণ পকেটে রেখে দেবে যেখানে সে সযত্নে রাখত তার সোনার ঘড়িটি, প্রিয়ার ছবিটি, মায়ের শেষ চিঠিখানি। তারপর মৃতের শেষ-স্মৃতিগুলো যখন ম্যাকআর্থারের লোকেরা পাঠিয়ে দেবে তার আত্মীয়স্বজনের কাছে, তখন হয়তো এ-চিঠিখানাও গিয়ে পড়বে তাদের হাতে। তখন তারা পড়বে এ-চিঠি, পড়বে তার বন্ধুরা, পড়বে

হাজার হাজার পশ্চিম ভার্জিনিয়ার বিংশতি বর্ষিয় অন্যান্য যুবক সাদরিকেরা, যারা ঠিক এই ভাবেই দুর্ভাগ্যের জালের বন্ধনে বাঁধা পড়ছে আজ। আমার এই চিঠিটি জরুরী, কারণ যদিও মৃত ফিরে আসবে না আমরা জানি, কিন্তু যারা বেঁচে আছে, আমেরিকার জনসাধারণ এখনও সচেষ্ট হলে তারা রক্ষা পেতে পারে।

পত্রিকার সংবাদটিতে সৈনিক সাদরিকের মৃত্যুর বিষদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে…কি ভাবে কোরিয়দের প্রতি-আক্রমণের সম্মুখে মার্কিনরা তাদের আহত ও হত সৈনিকদের পিছনে ফেলে রেখে দ্রুত পশ্চাদবসরণ করেছিল। সুতরাং সৈনিক কেনেথ সাদরিক, তুমি এখনও কোরিয়ার ঐ উষরভূমিতে খোলা আকাশের নীচে মৃত অবস্থায় পড়ে আছ। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার বুকের বুলেটের ক্ষত-চিহ্ন, তোমার বেদনাহত চোখের চাহনি যেন আমার চোখের উপরে ভাসছে, আমি দেখতে পাচ্ছি দিনের আলোয় তোমার সোনালী চুলগুলো যেন বাতাসে উড়ছে। ক্রোধের সঙ্গে মিশে আমার বেদনাতুর হৃদয়ে প্রশ্ন জাগে: 'কে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এল কোরিয়ার এই শ্মশানে? কে তোমাকে হুকুম দিয়েছিল তোমার প্রিয় ভূমি পশ্চিম ভার্জিনিয়া ছেড়ে আসতে? তোমার ভাই বোন, তোমার মা, তোমার প্রিয়াকে ছেড়ে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে কে তোমাকে পাঠিয়েছিল এই পাগলামির মধ্যে? উনিশ বছরের বালক তুমি…সমগ্র জীবন তোমার সামনে পড়ে আছে…কে তোমার হাতে বন্দুক গুজে দিয়ে পাঠাল কোরিয়ার অচেনা অজানা বিদেশী পাহাড়-উপত্যকার রণভূমিতে?' এই সব প্রশ্নের জবাব আজ আমাদের

খুঁজে পেতে হবে, কারণ, এরই উপর আজ বিশ্বের শান্তি নির্ভর করছে।

তুমি আমাকে চেন না সৈনিক সাদরিক। আমার আত্ম-পরিচিতি তোমাকে দেব। আমার নাম কৃষণ চন্দর। সেদিন পর্যন্ত পাঞ্জাবের লাহোর শহরের এক ঘিঞ্জি গলিতে আমার আবাস ছিল। সে-গলির নাম চক মত্তি। সে-গলির নতুন নামকরণ এখন যে কি হয়েছে আমি বলতে পারব না। খুব আশ্চর্য লাগছে এ-কথা শুনে তোমার! তোমার জীবন নেওয়ার পেছনে যাদের ষড়যন্ত্র, তারা যে আমার দেশও নিয়ে গেছে, শহর নিয়ে গেছে, আমার ছোট্ট গলি থেকে আমাকেও করেছে বঞ্চিত। তুমিও যেমন আজ ইচ্ছে করলে তোমার প্রিয় আবাসভূমে ফিরে যেতে পার না সৈনিক সাদরিক, আমিও তেমনি পারি না ফিরে যেতে আমার প্রিয় গলির বুকে। শুধু কি দুর্ভাগ্যের ললাট-লিখন বলেই একে ধরে নেবে সৈনিক, না, এর পেছনে হৃদয়হীন, মানবদ্বেষী রাজনীতিকদের লজ্জাস্কর হিংস্র ষড়যন্ত্র খুঁজে দেখবে? যার ফলে তোমাকে হারাতে হয়েছে তোমার অমূল্য জীবন, আমাকে হারাতে হয়েছে আমার প্রিয় স্বদেশভূমি? তুমি এবং আমি—একজন মৃত, আর একজন জীবন্ত—এ-প্রশ্নের জবাব আমাদের পেতেই হবে যে আজ। অতীত ও বর্তমান··· একসঙ্গে মিলে খুঁজে পেতে হবে ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশ। আমেরিকায় আমি কোনদিন যাইনি, কিন্তু আমার কল্পনার আমেরিকাকে আমি জানি অত্যন্ত গভীর ভাবে। তার সর্ব অবয়বের সমস্ত লীলায়িত সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে আমি জানি তার কুৎসিত রেখাগুলিও···

মৃত মার্কিন সৈনিকের উদ্দেশ্যে

আমেরিকার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল আমার ইংরাজী শিক্ষার প্রথম বইয়ের একটি ছোট্ট গল্পের ভিতর দিয়ে। সে-গল্প ছিল আমেরিকার সেই মহাত্মা দেশসেবক সদা সত্যবাদী জর্জ ওয়াশিংটন সম্বন্ধে। আমার বাল্যকালে পড়া সেই গল্পটি আমার জীবনে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল…আমি তখন ভাবতাম যে আমেরিকার সব লোকরাই অত্যন্ত খাঁটি, অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। অনেক বছর পরে আমি তখন বড় হয়ে উঠেছি। উচ্চশিক্ষার জন্য লাহোরের আমেরিকান শিক্ষা কেন্দ্র ফোরমান ক্রিশ্চিয়ান কলেজে ভর্তি হয়েছি। এখানেই আমি আমার কল্পনার আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হই। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস এবং ক্রিতদাসপ্রথার বিরুদ্ধে আমেরিকার দক্ষিণী রাষ্ট্রে যে অন্তর্বিপ্লব হয়েছিল তার ইতিহাস পড়ি। সেই সব যুদ্ধ ও বিপ্লবে যেসব মহান আমেরিকান জন সাধারণ যোগ দিয়েছিলেন- তাঁদের কথা যখন জানতে পারি তখন সেই সব মহান যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়ি, তাঁদের প্রতি দুনিয়ার সকল দেশের সাধারণ লোকের মতই আমার মনেও প্রগাঢ় ভালবাসা ও সম্মান উপচে ওঠে। আমার আমেরিকান প্রফেসররাও শিক্ষা দিয়েছিলেন খাঁটি মানুষ হওয়ার, সত্যবাদী হওয়ার, পক্ষপাতহীন চিন্তাশীল হওয়ার, সাধারণ মানুষের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখবার। তাঁরা আমাকে বলেছিলেন এ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের কথা, মুক্তির প্রতিমূর্তির কথা। আমি শিখেছিলাম কিভাবে সেই বিস্তীর্ণ দেশে ছোট ছোট গণ্ডিবদ্ধ প্রাচীন সাম্প্রদায়িক সমাজের পটভূমিতে কি বিরাট সভ্যতা স্থাপন করেছিলেন সেই সব অগ্রণী বীরেরা তাঁদের প্রথম পদক্ষেপের সাথে

সাথে…কি কুশলী হস্তের সুনিপুণ কর্মব্যস্ততাই না ছিল তাঁদের সেই উপনিবেশ গড়ে তোলার পিছনে! আমি পড়লাম মার্ক টোয়েইন, ড্রেইসার, ওয়াল্ট হুইটম্যান…প্রিয় বন্ধুর আন্তরিকতা যেন ফুটে রয়েছে হুইটম্যানের কবিতায়। তারপর একদিন ইতিহাসের প্রফেসর আমায় একটি উপহার দিলেন…পল রোবসনের গানের একখানা রেকর্ড। সে কি গান! সৃষ্টির বেদনাশ্রু-আনন্দ জড়িয়ে মিশিয়ে আছে সেই গানে, সেই কণ্ঠের প্রগাঢ়তায়। আমি সে-গান শুনি আর বিমোহিত হয়ে থাকি…আমার চোখে ভেসে ওঠে আমেরিকার সেই বিস্তীর্ণ মাটির বুকে হেসে-ওঠা সোনালী হলদে ড্যাফডিল ফুল…চকচকে চোখ খুলে পিটপিট ক'রে তারা চাইছে চারদিকে…লক্ষ লোকের সুদৃঢ় সুবিমল হাতগুলো ছন্দে ছন্দে মিলে কাজ করছে সেই বিশাল মাটির বুকে…আমার চোখে ভেসে ওঠে, কানে বেজে ওঠে স্কুলের ছেলেমেয়েদের হৈ হুল্লোড় হাসির কলধ্বনি…আমি যেন শুনতে পাই বিশাল জঙ্গল পেরিয়ে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে প'ড়ে শব্দ তুলতে তুলতে ছুটে চলেছে আমেরিকার যে খরস্রোতস্বিনী তার লীলায়িত গর্জন-ছন্দ। শুধু একটি গান! একটি গানের ভেতর দিয়ে, পল রোবসনের সেই প্রগাঢ় কণ্ঠের মাধ্যমে আমেরিকার কি বিশাল সৌন্দর্য, কি কোমলতাই না ফুটে ওঠে! আমেরিকার জনসাধারণের এই উজ্জ্বল সুন্দর পরিচিতির জন্য সত্যিই আমি রোবসনের কাছে শ্রদ্ধাবনত, আমার অন্যান্য আমেরিকান বন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি বুঝি, আমার দেশের সাধারণ লোকের মতই তারা সরল সোজা অত্যন্ত খাঁটি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ন জন-সাধারণ…

কিন্তু আর একটি আমেরিকাও আছে···যে-আমেরিকা জন সাধারণের আমেরিকা নয়। সে-আমেরিকা শাসকদের আমেরিকা, সেনাধ্যক্ষদের আমেরিকা, ব্যবসাপতিদের আমেরিকা। এই আমেরিকার অধিকর্তা হ'ল ফোর্ড, ডুলেস, ড্যুপোঁ, রকফেলার···আরও যেন এ-জাতীয় কিছু লোকের নাম শুনেছিলাম, কিন্তু ছাই, সব নাম কি আর সব সময়ে মনে থাকে! এদের এই আমেরিকা সম্বন্ধেই তোমাকে আমি লিখব বন্ধু। কারণ, এই লোকগুলোই তোমাকে ঠেলে পাঠিয়েছে কোরিয়ার ধ্বংসাঙ্গনে, তোমার মৃত্যুর কোলে। যদি পারত, আমাকেও এরা ঠেলে দিত মৃত্যুর কোলে এই ভাবেই। বিরাট বিরাট ব্যবসার মালিক এরা···বিশাল কার্টেল সাম্রাজ্যের অধিপতি তারা—সোনা, কয়লা, লোহা, তুলা, শুয়োর, মানুষ, আলু, যুদ্ধাস্ত্র বিষাক্ত ওষুধ, এবং আরও কত সজীব নির্জীব পণ্যদ্রব্যের কারবারে এরা মুনাফা লোটে। মুনাফা শিকারের পণ্য হিসাবে তোমাকে এরা বেচে দিয়েছে কোরিয়ার রণাঙ্গনে। তোমাকে রপ্তানির সময় এরা বলেছিল না, যে, কোরিয়ায় মার্কিন জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য তোমাকে লড়তে হবে কোরিয়ার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে? তুমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করতে যে কোরিয়া দেশে এই মার্কিন জাতীয় স্বার্থটি কি? যদি বলতে পারতে: 'নিয়ে এস সেই জাতীয় স্বার্থকে আমার পশ্চিম ভার্জিনীয়া প্রদেশে···দেখিয়ে দেব কি ভাবে সেই স্বার্থকে জান কবুল ক'রে রক্ষা করতে হয়!' কিন্তু তুমি, সৈনিক কেন্নেথ সাদরিক, তুমি তো এ-প্রশ্ন করতে পার নি তোমার দেশের অধিপতিদের। এবং সেই না-পারাটাই যে হয়েছে তোমার মারাত্মক ভুল, যে-ভুলের জন্য কি চড়া

দামই না আজ তোমাকে দিতে হ'ল। আমি এ-জন্তে তোমাকে দুষছি না; বন্ধু, কারণ, এই সওদাগর অধিকর্তারা নিজেদের শয়তানী ইচ্ছাকে আড়ালে রেখে কি সুনিপুণ ভাবেই না সাধারণ লোককে ধোঁকা দেয়! গত যুদ্ধে জাপানের হাতে পার্ল হার্বারের পতনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এই মার্কিন সওদাগরেরাই তো পুরানো লোহা বিক্রী করেছে জাপানের কাছে! দু'পয়সা মুনাফার জন্য এরা দেশ বিক্রী ক'রে দিতে পারে, আর, তুমি সৈনিক সাদরিক, তোমার জীবনের দাম তো দু'পয়সাও নয়! এই ভাবেই হাজারে হাজারে মার্কিন যুবকদের এই রক্ত-পিশাচেরা তথাকথিত গণতন্ত্র রক্ষার বুলির আড়ালে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুড়ে দেবে যতদিন না তারা বুঝতে পারবে যে তারা সত্যিসত্যি গণতন্ত্র রক্ষার জন্য লড়ছে না, লড়ছে কোরিয়ার কয়লার জন্য, সৌদি আরবের তেলের জন্য।

অত্যন্ত দুঃখবিজড়িত হৃদয়বিদারক কাহিনী সেটি সৈনিক…এবং এর সূত্রপাত হয়েছিল সেই সুঅতীত ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যেদিন মার্কিন নৌ-সেনাপতি পেরী জাপানের উপকূলে যুদ্ধ জাহাজে হাজির হয়ে সঙ্গীন উঁচিয়ে দাবী করেছিল ব্যবসা-করার। সেই ১৮৫৪…জাপানের সমুদ্রোপকূলে হানা দিয়েছিল পেরী, আর ইংরেজরা হানা দিয়েছিল দিল্লীর দরজায়, ঘা দিয়েছিল সমগ্র এশিয়ার বুকে—সেই বসফেরাস থেকে ব্যঙ্কক এবং ব্যঙ্কক থেকে অন্যান্য দেশগুলোকে একে একে ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরারা বুটের তলায় আছড়ে ফেলল। সেই বিশ্বাসঘাতক সাম্রাজবাদী শক্তিগুলি এশিয়ার বুকে হানা দিয়েছিল শোষণের এবং মুনাফা লুটের জন্য, কিন্তু নিজেদের আসল উদ্দেশ্য সুকৌশলে আড়ালে রেখে

চেঁচিয়ে বলেছিল যে বর্বর প্রাচ্যের পৌত্তলিকতাকে দূর ক'রে খ্রীষ্ট সভ্যতা বিস্তার করার মহান কাজেই তারা এসেছে এশিয়ার এই সব বর্বর দেশে। আজ এশিয়ার দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের সেই চিৎকার বন্ধ হয়েছে। আজ তারা নতুন আওয়াজ তুলেছে: গণতন্ত্র বনাম কমিউনিজম। আওয়াজ তারা বদলিয়েছে বটে, কিন্তু এ-যুগের এই সব মৃত্যুর কারবারীরা সেই পুরানো সাবেক কালের ঐ একই শয়তানের বংশধর। আমি তাদের আসল নগ্ন চেহারা ঠিক দেখতে পাচ্ছি, এবং আমি কামনা করি যে লক্ষ লক্ষ সৈনিক সাদরিকেরাও আমার মত দেখতে পাক এই মার্কিন বিশ্বপ্রেম, এই মার্কিন দানের কি আসল রূপ। এই দেখতে-পাওয়াটাই যুদ্ধ সমাপ্তি এগিয়ে আনবে।

প্রাচীন ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে দেখ সৈনিক…

১৭০০ খৃষ্টাব্দে চীন দেশের বক্সার-বিদ্রোহ…

সে-উত্থান হয়েছিল সমস্ত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীশক্তির বিরুদ্ধে। যে-উত্থান সফল হতে পারে নি। অত্যন্ত হিংস্রভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা সক্ষম হয়েছিল সে-বিদ্রোহ ভেঙ্গে দিতে। সেই দিন থেকে সুপ্রাচীন মহান চীন দেশের ভাঙা উন্মুক্ত কপাট দিয়ে প্রবেশ করেছে অনাহূতেরা, ডাকাতেরা…শোষণ করেছে…একটি সুপ্রাচীন জাতির সমগ্র জাতীয় সত্বা ও সম্মানকে দু'পায়ে পদদলিত করেছে। তারা বন্দর দখল করেছে, নদী আয়ত্বে রেখেছে, মহাচীনের জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত চাবিকাঠি অধিকার করেছে। তারপর এল প্রথম মহাযুদ্ধ…প্রাচ্যের পূর্ব সীমান্তে আমেরিকা তার সাম্রাজ্যের ঘাটি দৃঢ় ও সংগঠিত ক'রে নিল।

আর এই গতযুদ্ধে প্রাচ্যের পূর্ব সীমান্তে চীন মহাদেশকে পকেটস্থ ক'রে আমেরিকা হ'য়ে দাঁড়াল প্রায় একচ্ছত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। কোরিয়ার বুকে ৩৮ সমাক্ষরেখা ধরে দুটুকরো ক'রে তারই একটা অংশ আত্মসাৎ ক'রে বসল…চার হাজার বছরের সুপ্রাচীন সভ্যতা, একটা গোটা ইতিহাসকে দুটো টুকরোয় ভাগ ক'রে দিল। মানবতার বিরুদ্ধে বিরাট অপকর্ম এই কৃত্রিম বিভাগ। একটা জাতির সমগ্র সত্বাকে তো অক্ষ ও নিরক্ষ রেখা টেনে ভাগ করা যায় না। কোন্ সুপ্রাচীন কাল থেকে একক অবিভক্ত পূর্ণ জাতীয় সত্বা নিয়ে কোরিয়া আছে, এবং ভবিষ্যতেও কোরিয়ার জন সাধারণের ইচ্ছানুযায়ীই তাদের দেশ আবার পূর্ণ অর্থ নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সত্বা নিয়ে দাঁড়াবে। কোন বিদেশী শক্তির এমন ক্ষমতা নেই যে এশিয়ার বুকে তার সৈন্য নামিয়ে দিয়ে এমনি ভাবে কৃত্রিম দেশ-বিভাগকে জিইয়ে রাখতে পারে। যদি কেউ তা করে, সে গণতান্ত্রিক নয়, সে আক্রমণকারী।

কোরিয়ার জনসাধারণই তাদের ভবিষ্যত নিজেরাই ঠিক করবে, তারাই ঠিক করবে কি বিশেষ ধরণের গভর্ণমেণ্ট তাদের চাই, তারাই নির্বাচন করবে তাদের প্রতিনিধিদের, তারাই বিবেচনা করবে তাদের অর্থ নৈতিক কাঠামো কি হবে, তাদের জাতীয় পতাকার রং ও রকম কি হবে, তাদের পররাষ্ট্র নীতি কি হবে। এ সব সম্বন্ধে বাইরের লোকের কোন নির্দেশই তারা মানতে পারে না। কোরিয়রা এক সাথে মিলে মিশে যদি এসব সমস্যার সমাধান করতে পারে, ভাল। যদি তারা অর্ন্তবিপ্লবের সাহায্যেই সে-সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়, তাই তারা করুক। তোমাদের দেশের

ইতিহাস দেখ। সেখানেও উত্তর দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোকে মেলাবার জন্য তোমরাও তো অন্তর্বিপ্লবের পথে গিয়েছিলে। কই কোরিয়া তো সেদিন তোমাদের কোন বাধা দিতে যায় নি। ইংল্যাণ্ডেও অন্তর্বিপ্লব হয়েছিল। তারা তো তাদের রাজার মাথা পর্যন্ত কেটে ফেলেছিল। কই কোরিয়ার [illegible] রাজা তো সেদিন ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্রকে রক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ডে কোরিয় সৈন্য পাঠায় নি। কিন্তু আজ কেন ইংল্যাণ্ডের নৌবাহিনী কোরিয়ার উপকূলে হানা দিয়েছে? হাঁ, তারা বলে যে তারা এসেছে ৩৮ সমাক্ষ রেখাকে রক্ষা করতে। কি জানি কাল হয়তো তারা যাবে কর্কট-ক্রান্তি-বৃত্ত রেখাকে রক্ষা করতে! ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা সত্যই এক অদ্ভুত জীব!

সে যাই হোক, এশিয়ার লোকেরা কিন্তু আজ আর এই ৩৮ সমাক্ষ রেখার গালভরা গল্পে বিশ্বাস করে না। তারা জানে যে কোরিয়ার ধ্বংসাঙ্গনে ইং-মার্কিন সৈন্যরা যে সমাক্ষ রেখা রক্ষার জন্য লড়াই করছে, সেটি হ'ল আর একটি অক্ষ রেখা, সেটি হল সাম্রাজ্যবাদী অক্ষরেখা। এই নৃশংস সমাক্ষ রেখাটি এশিয়ার বুক ভেদ ক'রে যে-সব স্থান ছুঁয়ে গেছে, সেখানেই নেমেছে বিরাট ধ্বংস, বিরাট ভাঙ্গন। এই রেখাটি গেছে প্যালেষ্টাইন ছুঁয়ে: সৃষ্টি হয়েছে ইস্রায়েল ও জর্ডান। আমাদের ভারত ভূমির বুক চিরে গেছে এই রেখাটি: সৃষ্টি হয়েছে ইণ্ডিয়া ও পাকিস্তান। ব্রহ্মদেশকে এই রেখাটি ভাগ করেছে বর্মা ও কারেন স্টেটে। ইন্দোনেশিয়া পরিণত হয়েছে ইন্দোনেশিয়া, পূর্ব বোর্ণিও এবং নিউ-গিনিতে। এই রেখার ছোঁয়ায় আজ ইন্দোচীন বিভক্ত বাও-দাইর

পুতুল-গভর্ণমেণ্ট ও ভিয়েৎনামে। এই সমাক্ষ রেখাটি হল বিভাগের নিশানা, একতার চিহ্ন নয়। পূর্বের মতই সাম্রাজ্যবাদীরা আজও এশিয়ার দেশে দেশে দালাল খুঁজে বের করছে, তাদের দেশী সহযোগী অনুচর জোগার করছে এবং এদেরই কপালে 'খাঁটি নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী'র লেবেল সেঁটে বাকী আর সকলকে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে, তাদের এইসব সংগৃহিত অনুচরদের স্বদেশী গভর্ণমেণ্টের আড়ালে থেকে সাম্রাজ্যবাদী রক্তশোষণ চালিয়ে চলেছে।

এবং এই ঘটনাই আজ চলেছে এশিয়ার প্রায় সবগুলো ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে। গত যুদ্ধের পরে এশিয়ার দেশে দেশে জনসাধারণের সংগ্রামের মুখোমুখি না দাঁড়াতে পেরে সাম্রাজ্যবাদ আড়াল নিয়েছে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নেতাদের পিছনে, যে-লোকগুলো আসলে সাম্রাজ্যবাদের দালাল ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু এশিয়ার জনগনের বিরাট সংগ্রাম সাময়িক ধীর হলেও নিশ্চিতভাবে এই সব পুতুল-গভর্ণমেণ্টের মেরুদণ্ডে আঘাত হানছে। আড়াল ছেড়ে সাম্রাজ্যবাদকে আবার জন সাধারণের মুখোমুখি এসে দাঁড়োতে হচ্ছে। এবং এইভাবেই বন্দুক হাতে সাম্রাজ্যবাদ এসেছে কোরিয়ার আঙ্গিণায়। এই জন্যেই আজ, সৈনিক সাদরিক, তোমাকে জীবন হারাতে হয়েছে।

এই কথাই তোমাকে আমি ভাল ক'রে বোঝাতে চাইছি সৈনিক সাদরিক। কারণ, তোমাদের এই বিরোধের মূল বোঝার ওপরেই আজ দুনিয়ার শান্তি নির্ভর করে। আমেরিকার জন সাধারণের ওপরও আজ বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে, কারণ, সমগ্রভাবে তারাই তো লক্ষ লক্ষ

সৈনিক সাদরিকের প্রতিনিধি। তোমরা তোমাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের বল, ওয়াল ষ্ট্রীটের ব্যাঙ্কমালিকদের বল, কার্টেল-মুনাফাখোরদের বল যে আমেরিকার জীবন প্রণালী এশিয়াবাসীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাও না তোমরা। (মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের আমেরিকার জীবন-প্রণালী কিছু দেখায় নি, দেখিয়েছে আমেরিকার ধ্বংস-প্রণালী নাগাসাকি, হিরোসিমায়।) কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে যে দস্যুবৃত্তি সুরু করেছে তোমাদের শাসক ও মিলিটারী অধিকর্তারা, তাদের তোমরা দৃঢ়কণ্ঠে বল যে কোন 'মতবাদের' বিরুদ্ধেই তোমরা লড়তে চাও না, সে-মতবাদ কমিউনিজমই হোক, কিংবা বুদ্ধধর্মই হোক। এশিয়ার জনসাধারণ যদি বিশেষ কোন 'মতবাদ'-এর বিরুদ্ধে কিংবা স্বপক্ষে লড়তে চায়, তবে তারা নিজেরাই তার সালিশ হোক। তোমাদের কিছু করার থাকতে পারে না এর মধ্যে। তোমাদের দেশে কাজের মধ্য দিয়ে, সৈনিক সাদারিকেরা, যুদ্ধবাজদের সমঝিয়ে দিতে হবে তোমাদের যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কোনস্থানেই, য়ুরোপ, এশিয়া কিংবা আফ্রিকার কোন দেশেই দখলকারী লড়াইয়ে তোমরা লড়বে না। সে-সব দেশের জনসাধারণই নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করুক।

আমার চিঠির লেখার ধরণ দেখে তোমার হয় তো মনে হতে পারে, সৈনিক সাদরিক, যে তোমার মৃত্যুতে সত্যিই আমি দুঃখীত নই। কিন্তু তা ঠিক নয় বন্ধু। তোমার জন্যে সত্যিই আমি অত্যন্ত দুঃখীত। হ্যাঁ, আমার চোখে আজ সত্যিই জল জমে ওঠে নি, কারণ, যে দুঃখ বেদনা সামাজিক অবিচার দেখেছি আমি আমার দেশে, তাতে বহুদিন আগেই

আমার বিগলিত হৃদয়ের সমস্ত বেদনাশ্রু ঝরে গেছে। বিশ্বাস কর বন্ধু, আমার হৃদয়ে আজ শুধু জলছে ক্রোধের অগ্নি শিখা, আমার মনে জমে উঠেছে সেই সব লোকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা যারা তোমাকে পাঠিয়েছিল কোরিয়ায় নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে।··· কিন্তু এ-মৃত্যু-খেলার প্রস্তুতি তো সুরু হয়েছিল অনেক অনেক দিন আগে, এবং তারও পিছনে একটি কাহিনী রয়েছে···

১৯০৫···রুশ-জাপান যুদ্ধ···চীন মহাদেশে জোর ক'রে জাপান প্রবেশ করছে। জাপানী ফৌজের সাথে রয়েছে একজন "নিরপেক্ষ সামরিক দর্শক'—আমেরিকার ওয়েষ্ট পয়েন্ট থেকে আগত একজন যুবক লেফটানেণ্ট। আশ্চর্য, তার নামও ম্যাকআর্থার!···আজ যখন আমি সে-কথা ভাবি, আমার মনে হয় 'নিরপেক্ষ দর্শক' হিসেবে সেদিন সে-লোকটি আসে নি। সেই সময় থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা প্রাচ্যের পূর্বসীমান্তের ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের ওপরে লোলুপ দৃষ্টি ফেলছিল। আমার মনে হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যে-উদ্দেশ্যে ম্যাকআর্থার চীনে এসেছিল, তার পূর্ণ সফলতা ঘটেছিল ১৯৪৫-এ। ১৯০৫ সনে যেদিন ম্যাকআর্থার কোরিয়ার উপকূল অতিক্রম করেছিল, সেইদিনই তার পকেটে তোমার মৃত্যুপরোয়ানা ছিল সাদরিক। তোমার জন্মের বহুপূর্বেই তোমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়ে গিয়েছিল। যুবক, কিশোর, স্কুলের ছেলেদের পাঠিয়েছে এরা যুদ্ধক্ষেত্রে, যে-বয়সে এদের খেলে বেড়াবার কথা! এই ভাবে ঠাণ্ডা-স্থিরমস্তিষ্কে নৃশংস হত্যা করলে চোখে জল জমে ওঠে না, সৈনিক, জমে ওঠে যুদ্ধ-বাজদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ক্রোধ ও চাপা উত্তেজনা, তাদের খতম ক'রে দেবার জন্ম সুতীব্র ইচ্ছা। এই জন্যই তোমার হত্যায় আমার চোখে জল জমে ওঠে নি সাদরিক।

মৃত মার্কিন সৈনিকের উদ্দেশ্যে

সৈনিক কেন্নেথ সাদরিক, তোমার জন্য সত্যিই আমি দুঃখীত। বোধহয় তোমার সেনাপতি ম্যাকআর্থার জানেও না যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিক মারা গেলে কি হারিয়ে যায়। তার হিসেবে তুমি তো তার মানচিত্রের একটি পিন মাত্র। কিন্তু আমি তো জানি যুদ্ধক্ষেত্রে একটি বিশ বছরের যুবক সৈনিকের মৃত্যুর মানে কি!

ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়ার বিশ বছরের যুবক সৈনিক সাদরিক কোরিয়ায় মারা গেছে; তার সঙ্গে মারা গেছে বহু কিছু। মারা গেছে একখানা বই। মুছে গেল একটি গান। হয়তো মুছে গেল অজ্ঞাত এমন কিছু সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যার ফলে সমস্ত দুনিয়া হলো ক্ষতিগ্রস্ত। থেকে গেল একটা বিরাট কিছু হারানোর অনুশোচনা। ম্যাকআর্থারের কাছে হয়তো মানচিত্রের একটি পিন হারানোব ক্ষতিও নয় তোমার এই অপমৃত্যু, কিন্তু দুনিয়ার সব হৃদয়বান মানুষের কাছে সত্যিই এটি বিরাট ক্ষতি। সৈনিক সাদরিক, তোমার এই অপমৃত্যুর সংবাদে যে-কোন হৃদযবান মানুষ ব্যাথায় বেদনায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন, কারণ তোমার মৃত্যুর কোন প্রয়োজন কেউ বুঝতে পারে না। মানুষের শান্তির উপরে কেন এই বাব বার আক্র-মণ? আমাদের এই বিপুলা ঐশ্বর্যময়ী বসুন্ধরার বুকে আমরা সকলেই তো পরমানন্দে বাস করতে পারি। কি না আছে এখানে? উর্বরা বসুমতির কোলে হেসে ওঠে প্রচুর গম, জই, জনার, তুলো···ঢেউয়ের মত লুটোপুটি খেতে খেতে পাহাড়ের পর পাহাড় গেছে উঠে, তারই কোলে কত বন্য জীব, কত খনিজ পদার্থ, কত কাঠ···বড় বড় নদী ও হ্রদের বুকে অফুরন্ত জল-বিদ্যুৎ···। কত সুখে কত আরামে-আনন্দে আমরা বাস করতে পারি

এই ধরার ওপরে। আমাদের এই পৃথিবী থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আমরা যদি তাকাই একটু দূরে, কি দেখতে পাই আমরা তখন ? বিরাট শূন্যের মধ্যে লক্ষ লক্ষ পৃথিবীর মত কত গ্রহ তারা ছুটে চলেছে। যদি সাহস থাকে, যদি চাও, তবে এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোক এক একটি ক'রে গ্রহ-তারা নিতে পারে। তার বিশালত্ব নিয়ে, বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে মানুষের সর্বশক্তি, দুঃসাহসকে আহ্বান করছে প্রকৃতি। অজ্ঞানতার তিমির পর্দা ছিঁড়ে ফেলে, কোরিয়ার একটি ঢিবি দখলের লড়াই ছেড়ে দিয়ে, এই দুনিয়ার কিছু লোক যদি একবার তাকাতো ঐ মহাশূন্যের পানে, হাইড্রোজেন বোমা তৈরীর পিছনে কোটিতে কোটিতে ডলার না উড়িয়ে সেই বিরাট শক্তি যদি নিয়োজিত হত অন্যান্য কল্যাণকর বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার পিছনে, আমাদের এই পৃথিবী আরও কত সুন্দর, আরও কত বাসপোযোগী হত।

চিঠিটির শেষ কয়েক লাইন লিখতে লিখতে মুহূর্তের জন্য আমার দৃষ্টি পাশের উন্মুক্ত জানালা দিয়ে বাইরে গেল চলে...আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে কত দৃশ্য...তাল গাছের বড় বড় পাতাগুলোর মর্মর ধ্বনি টেলিগ্রাফ তারের লম্বা খুঁটির ওপর দিয়ে এসে নীচের জলাভূমির সবুজ ঘন গুল্মের ওপর দিয়ে ধীরে গড়িয়ে চলেছে...দূরে, জলাভূমির ওপারে আম্বেরির ঢিবিগুলো ঢেউয়ের মত গড়িয়ে গড়িয়ে ভিহারের ছোট ছোট পাহাড়ের সঙ্গে মিলে আস্তে আস্তে মিশে গেছে দূরের, আরও দূরের কুয়াশা-ঘন গ্রীষ্মের মৌসুমী মেঘের সাথে। এই রকমই কোন একটি ঢিবির ওপরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে ভীতিজনক নির্জনতার মাঝে তুমি পড়ে আছ... মৃত, তুষার-শীতল, নিথর...। তোমার কথা ভাবছি

মৃত মার্কিন সৈনিকের উদ্দেশ্যে

আমি, ভাবছি আরও কত শত শত সাদরিকের কথা…বয়স কুড়ি…এসেছে তারা পশ্চিম ভার্জিনিয়া, কানসাস, ওহিও, টেক্সাস, সিনসিনাটি থেকে। ভাবছি আমি সেই সব সৈনিক সাদরিকদের কথা যাদের বয়স এখনও কুড়ি পার হয়নি। ভাবছি তাদের কথা যাদের বয়স ১৯, ১৮, ১৭, ১৬…। আমার মনে পড়ে গেল আর একজন সৈনিক সাদরিকের কথা, যার বয়স মাত্র তিন। সে আমার ছেলে। তোমার বয়সে এলে তাকেও কি এরা তাদের স্বার্থ-রক্ষার যুদ্ধে এইভাবে বলি পাঠাবে? না, না…তা হতে পারে না, হতে পারে না। উন্মুক্ত নির্জন ঢিবির ওপরে তোমার মৃত দেহর পড়ে-থাকার দৃশ্য আমার চোখে ভেসে ওঠে বারে বারে। সঙ্কল্প দানা বেঁধে ওঠে আমার মনে, আমি প্রতিজ্ঞা করি : শান্তি চাই, শান্তি চাই এক্ষুনি, শান্তি চাই আমার জীবন-সময়ের মধ্যেই। শান্তি চাই সর্বসময়ের জন্যে, সকল মানুষের জন্যে।

বিবি

আগুন জ্বলছে, সিওল শহর পুড়ছে…

একটি ভাঙ্গা পাথুরে দেয়ালের গায়ে দেশলাইর কাঠি ঠুকে লিয়াম 'লাকি ষ্ট্রাইক' সিগারেট জ্বালিয়ে নেয়। তারপর চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে চারদিকে। শহরের ওপরে ধূম্রজালের আবরণ। বোমা বিধ্বস্ত সিওলের পানে তাকিয়ে ভাল লাগে লিয়ামের। চারদিকে ধ্বংসস্তূপ… ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাঁচ…দুমড়নো ইলেক্‌ট্রিক পোষ্ট…তারই ওপরে কোরিয়দের মৃতদেহ ঝুলছে। এখানে ওখানে আধপোড়া ছাদহীন পাঁজর বেরকরা কংক্রিটের অট্টালিকাগুলো হা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে…দরজা নেই, জানালা নেই। মৃদু হাসি ফুটে ওঠে লিয়ামের মুখে। মার্কিন বিমান বাহিনী বেশ সুষ্ঠুভাবেই কাজ করেছে তবে। 'গুক্‌স'-দের* গর্বের শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। খুব সহজ কাজ নয়…এই কোরিয় ব্যাটারা মরতে মরতেও লড়াই করে। খুব জোরে সিগারেটে দম দিয়ে লিয়াম আবার চারদিকে দেখে। আকাশমুখী ভাঙ্গা জলের পাইপ ও বড় বড়

---

* 'অ-সভ্য' এশিয়াবাসীদের উল্লেখ করতে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনরা এই পরিভাষা ব্যবহার করে।

বিবি

বাড়ীগুলোর লৌহ কাঠামোর ওপর দিয়ে লিয়ামের দৃষ্টি গড়িয়ে যায়। এই কাঠামোর ওপরেই গড়ে উঠেছিল কত সুন্দর অট্টালিকা, কত সুখ-নীড়, এইখানেই ছিল আধুনিক ফ্ল্যাট, অফিস, কর্মস্থল···শিশুদের কাকলী কণ্ঠের হাসিতে মুখরিত হয়ে থাকত এই সব গৃহ, মেয়েদের সুকণ্ঠের গানে গানে ভেসে যেত এই সব সুখ-আবাস, পুরুষদের কুশল কর্মের স্থান ছিল এখানেই। প্রশস্ত রাজপথের বুকে বিরাট বিরাট গহ্বর তৈরী করেছে মার্কিন বিমান বাহিনী। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম থেকে বারে বারে আক্রমণ ক'রে সমগ্র শহরকে তারা প্রথমে চারটে বর্গক্ষেত্রে ভাগ ক'রে বোমা ফেলে, তারপরে সেইগুলোকে আটটি বর্গক্ষেত্রে আবার ভাগ ক'রে বোমার আক্রমণ চালায়। এখানেই শেষ নয়, এরপরে সেই ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে চলে অগ্নিবর্ষণ ও পেট্রোলিয়াম জেলি বোমার আক্রমণ। এই সব দেখে পরিতৃপ্ত লিয়াম তার সাথীর দিকে ফিরে বলে : 'বেশ সুষ্ঠুভাবেই কাজ হয়েছে, জুস্!' সাথীর আসল নাম জোনস্, কিন্তু তার নরম চেহারার জন্য তার নাম হয়ে গেছে জুস্—রস! কোকা কোলার রস নয়, কমলার রস নয়, লেবুর রসও নয়। ছোট্ট জোনস। সরলতা মাখানো নরম কিশোর। এক মাথা প্ল্যাটিনাম-শুভ্র চুল, তার চোখের সবুজ মণিদুটো শুভ্র ভোমার পিছনে মুরগীর চোখের মত চিকচিক করে। খোচা-খোচা থুতনিটা হাত দিয়ে ঘষতে ঘষতে সে বলে : 'সুষ্ঠুভাবে হয়েছে ঠিকই, লিয়াম, কিন্তু যতক্ষণ চলে এই আক্রমণ, উঃ—'

কোন উত্তর দেয় না লিয়াম। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে একটি তিন তলা অট্টালিকার ওপর। একটি লম্বা দণ্ডের মাথায় বিরাট মার্কিন পতাকা—

তারকা খচিত ডোরাকাটা পতাকা—বাতাসে উড়ছে। অত্যন্ত পরিতৃপ্ত দৃষ্টি দিয়ে নাৎসি বিজেতার মত দেখতে দেখতে লিয়াম সিগারেটের পাছায় সুখটানের দম দেয়। নিঃশেষিত সিগারেটের ছাই উড়ে গিয়ে পড়ে তার চোখে মুখে। দুহাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে খক খক ক'রে কাশতে কাশতে গাল দিয়ে ওঠে লিয়াম অসভ্য এশিয়াবাসীদের :

'ওহ্! শালার এশিয়রা। খতম ক'রে দাও বেটাদের। ছিলাম ভাল সিনসিনাটিতে ইনসিওরেন্সের এজেন্ট হয়ে। শালারা টানতে টানতে নিয়ে এসেছে এখানে।'

'কিন্তু তুমি এখানেও কারও না কারও ইনসিয়রেন্স-এজেন্ট তো বটে!' মৃদু হাসতে হাসতে বলে জুস।

'মানে?'

'ঐ তো, দেখ না,' একটা আধপোড়া বিধ্বস্ত অট্টালিকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দেয় জোনস···আমেরিকার কতকগুলো সুবৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নামের সাইন-বোর্ড। বিরাট বিরাট করপোরেশন্ ও ট্রাস্টের নাম···গ্রেট অ্যামেরিকান ফেডারেল ইনসিওরেন্স করপোরেশন: 'লাইফ' এবং 'টাইম' পত্রিকা : চালের গুদাম—ফিলিপ্স ও ফিলিপ্স কোম্পানী : নিউ ইয়র্ক কয়লা পরিবাহক করপোরেশন, সমিতিবদ্ধ : চাল রপ্তানী ও কোকা কোলা আমদানীর কোম্পানী, সমিতিবদ্ধ, চিকাগো···

আনন্দে জিহ্বার নীচে আঙ্গুল দিয়ে বাঁশীর শব্দ ক'রে ওঠে লিয়াম : 'বাঃ, আমার নজরে তো পড়ে নি এতক্ষণ। এ সব তো আমাদেরই নাম।

সৈনিক হিসেবে আমরা গা-ই-রা* আসবার অনেক আগেই দেখছি অ্যামেরিকা এখানে এসে গেছে।'

'হাঁ। ঐ কমিউনিস্ট ও গুক্‌স্‌রা যাই বলুক না কেন, আমরা এখানে থাকবই।' ধীর কণ্ঠে জুস বলে।

'নিশ্চয়ই—' পকেটে হাত ঢুকাতে ঢুকাতে লিয়াম জোর দিয়েই বলে। লম্বা চেহারার লিয়াম। মাতৃকুলের দিক থেকে লিয়াম হল আধা আইরীশ ও আধা জার্মান। বাপের দিক থেকে তার দেহে আছে কিঞ্চিৎ-অধিক অষ্টমাংশ নিগ্রো শোণিত, অষ্টমাংশ জিপসি, আট ভাগের দু ভাগ মেক্সিকান রক্ত ও বাকী অংশ ফরাসী শোণিত। সোজা কথায় সত্যিকারের শতকরা একশ ভাগ আমেরিকান বলতে যাকে বোঝায়, লিয়াম হল ঠিক তাই। ট্রুম্যানের উপর তার পূর্ণ আস্থা আছে, সে বিশ্বাস করে এটম বোমা এবং নিগ্রো লিঞ্চিং-এ এবং প্রধান সেনাপতি ম্যাক-আর্থারের মত সেও চায় এশিয়দের একহাত দেখিয়ে দিতে। লিয়াম বাইরে বেশ সুস্থ হলেও, ভেতরে ভেতরে কিন্তু ভীতু। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, ভীতু, দাম্ভিক···তার সাথী জুসের মতই তার নোংরান্বেষী মন সহজে তুষ্ট হতে চায় না। লিয়াম ও জুস দুই বন্ধু, তাদের গভীর অন্তরঙ্গতার জন্যে সৈনিক মহলে তাদের একসূত্রে পরিচয় ছিল 'লিয়াম জুস' নামের মধ্য দিয়ে।

হঠাৎ সামনের ভাঙ্গা অট্টালিকার দোতলায় কয়েকজন গা-ই এসে মস্ত একটা কাপড় টাঙ্গিয়ে দিল। তাতে বড় বড় মোটা মোটা হরফে লেখা :

---

* মার্কিন সৈনিক।

'নিলাম, নিলাম···
সুযোগ হারিও না মনিয়া!'

পেরেক পুতে বারান্দায় কাপড়টা টানিয়ে দিয়ে তারা অট্টালিকার অভ্যন্তরে চলে গেল। লেখা পড়ে জুস লিয়ামকে কনুই দিয়ে খোঁচা দেয়, লিয়াম দেয় জুসকে। পরমুহূর্তে দুজনে ছোটে সেই বাড়ীর দিকে। কোরিয় ও মার্কিন মৃতদেহগুলো টপকে টপকে পার হয়ে তারা ছোটে। সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে দেখে এরই মধ্যে মস্ত বড় হলে বহু গা-ই এসে হাজির হয়েছে। সিঁড়ির শেষ প্রান্তে হলে ঢুকবার মুখেই পঞ্চাশ সেণ্ট দিয়ে এক একটি প্রবেশ পত্র কিনতে হয় তাদের।

হলে প্রবেশ ক'রে লিয়াম দেখে পানমত্ত গা-ইরা হৈ হুল্লোড় নাচ-গান করেছে। হঠাৎ এ-কোণে ও কোণে দু'একবার হুল্লোড় গোলমালের শব্দ উঠে ঢেউয়ের মত গড়িয়ে গিয়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। হলের এক কোণায় একটি মঞ্চ বাঁধা। মঞ্চটি বেশ উঁচু, ইচ্ছে করলেও কোন গা-ই হলের মেঝে থেকে তার উপরে লাফিয়ে উঠতে পারবে না। মঞ্চের চারদিকে মুষ্টিযুদ্ধের মঞ্চের মত মোটা দড়ি দিয়ে ঘের করা হয়েছে। শুধু পশ্চিম দিকের ওপরে একমাত্র প্রবেশ-পথের ওপরে একটি পর্দা ঝুলছে। মঞ্চের ওপরে কেউ নেই।

পাশের একজন গা-ইকে লিয়াম জিজ্ঞাসা করে: 'কি হবে জো? মুষ্টিযুদ্ধ?'

'না।'

'কোনো খেলা?'

'না।'

'তা হ'লে কি, সার্কাস?'

'তাও না।'

'তা হ'লে কি? এই জুস, চল চল। যত সব—' একটু রাগত কণ্ঠেই লিয়াম বলে ওঠে।

মুখের মধ্যে জিহ্বাকে জড়িয়ে নিয়ে পাশের গা-ই জবাব দেয়:

'অয়াল?' নিলাম হবে ব'লে তো মনে হচ্ছে, না?

'কিসের নিলাম?' লিয়াম জিজ্ঞাসা করে।

'কোন জিনিসপত্তর তো দেখছি না। আশ্চর্য বটে!'

'হাঁ, এই আশ্চর্য যুদ্ধে সবই আশ্চর্য মনে হয়। আশ্চর্য মঞ্চ। আশ্চর্য প্রচার, আশ্চর্য যুদ্ধজয়…হা ভগবান! এ-সব দেখে দেখে বড়ই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি।'

ঠিক সেই মুহূর্তে হলের মধ্যে বিরাট চিৎকার ধ্বনি উঠে। মঞ্চের পর্দাঘেরা পশ্চিমের প্রবেশপথ দিয়ে একজন মঞ্চের উপর এসে দাঁড়িয়েছে… যেন সপ্তদশ শতাব্দীর ক্রীতদাস বিক্রেতা। একহাতে লম্বা চাবুক, আর এক হাতে ছোট একটি ঘণ্টি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে সামনের দিকে দেহ ঝুঁকিয়ে মাথা নুইয়ে ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে সে বলে:

'শুনুন আপনারা, হে আমার এ্যাটমপুত্ররা! গুক্‌স্ ব্যাটাদের আমরা চেপে ধরেছি সিওলের যূপকাষ্ঠে। আজ আমরা বিজয়ী, সুখী, পরমানন্দিত। দেখুন, দেখুন আপনারা, হে আমার এ্যাটম-বরপুত্ররা, দেখুন এখানে আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নিলাম ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। এমন অদ্ভুত, এমন মনমাতানো,

এমন সুন্দর নিলাম-পণ্য দুনিয়ার কোথায়ও আপনারা পাবেন না, একথা আমি হলপ ক'রে বলতে পারি। আপনারা শুধু পকেট উজার ক'রে প্রস্তুত হয়ে যান…বিশ্বের এই অদ্ভুত নিলাম ঘরে আসুন, আসুন আপনারা, এ্যাটম বোমার বরপুত্রেরা, আসুন, বাছাই করুন, মনের মতন জিনিস কিনুন !'…জোরে জোরে ঘণ্টি বাজিয়ে পর্দার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে নির্দেশ দেয় বিক্রেতা। ধীরে ধীরে ভারী পর্দা সরে যায়…কতকগুলো কোরিয় যুবতীকে মঞ্চের উপর নিয়ে আসা হয়। মুহূর্তে গা-ই-দের সর্বচেতনা আছড়ে পড়ল মঞ্চের উপরে। হৈ হুল্লোড়, নাচ, শিষ একলহমায় যেন সব বন্ধ হয়ে গেল…মুহূর্তের মধ্যে অদ্ভুত দমবন্ধ নিস্তব্ধতা বিরাজ করে হলঘরে।

বিবস্ত্র উলঙ্গ কোরিয় যুবতীরা মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে মঞ্চের উপরে। পিছমোড়া ক'রে তাদের হাত বাঁধা…লজ্জা নিবারণের ক্ষীণতম প্রচেষ্টাও যাতে তারা না ক'রতে পারে। মাথার আলুথালু চুল খুলে পড়ছে। দর্শকদের মুখোমুখী ক'রে অর্ধ-চন্দ্রাকারে তাদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল…গা-ই-দের কামনা লোলুপ দৃষ্টির শর-আঁঘাতের সামনে অধোমুখী বিবস্ত্র নারী দাঁড়িয়ে থাকে। বহু দৃষ্টির সামনে মেলে ধরা থাকে কোরিয় কন্যার কম্পিত গ্রীবা…প্রেমাস্পদের সুখ-চুম্বনের পুষ্পমালার কত স্বপ্ন আঁকা থাকত ঐ গ্রীবা ঘিরে। খুলে ধরে দিয়েছে কোরিয় তরুণীর সুতনু উন্মুক্ত বক্ষ…নিষ্পাপ শিশুর ওষ্ঠ স্পর্শে যে-বক্ষ থেকে ঝরে পড়ত জীবন-মধু। স্মরাতুর পিশাচদের বীক্ষণ-দৃষ্টির সামনে নগ্ন ক'রে তুলে ধরেছে কোরিয় রমণীর বক্ষ-নিম্ন দেহ—কোরিয় মাতার নব-জীবনের

অঙ্কুর-গর্ভ। নব-জীবনের বীজ ছিল এই গর্ভে···ছিল বীজকোষ, নতুন পরিবেশে যার পরিণতি ঘটত নব অঙ্কুরে, নতুন জীবনের উন্মেষে···নতুন এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন সৃষ্টিতে। আজ সেই সৃষ্টিময়ী বসুমতী, সমগ্র এশিয়ার নারী, বিদেশী বিজেতার সামনে দাঁড়িয়ে···শৃঙ্খলাবদ্ধা, নগ্নদেহা। শতাব্দীর ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখলে দেখি, যেখানে যখনই জনসাধারণের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, পদদলিত হয়েছে, তখনই হয়েছে নারীত্বের চরম অপমান। দেখেছি চেঙ্গিস খাঁর তাঁবুতে, দামাস্কাসের বাজারে, গ্রীসের নারী বিক্রয়ের হাটে, রোমের এ্যাম্ফিথিয়েটারে, আমেরিকার দক্ষিণী রাষ্ট্রের নিলাম-হাটে, দেখেছি এই সেদিনও হিটলারের নাৎসি বাহিনী অধ্যুষিত অঞ্চলে নারীকে বিবস্ত্র হ'তে, দেখেছি নারীর চূড়ান্ত অবমাননা। এ-অপমান ঘটে সেইখানেই যেখানে নৃশংস অত্যাচারীর দৌরাত্ম্য-শাসন সুরু হয়। এদের সভ্যতার, এদের কৃষ্টির প্রতীক চিহ্নই হলো নারীত্বের এই অপমান, এই নৃশংসতা। বিবস্ত্র নারী ব্যথাতুর মাতার মত হয় তো প্রশ্ন করেছে: 'তোরাই না জন্মেছিলিস আমার গর্ভে? আজ তোরা মাকে বিবস্ত্র করছিস্, নারীত্বের অপমান করছিস্? ছোট ছোট শিশুদের পুড়িয়ে মারছিস? বৃদ্ধের বুকে বেয়নেট বিঁধিয়ে চিরে ফেলছিস্? এই অপকর্মের জন্যই কি তোরা জন্মেছিলি, এই কুকর্মের জন্যেই কি তোরা এসেছিলি এই সুন্দর ধরার বুকে?··· ···তোমাদের মনে কি একবার প্রশ্নও জাগে না, একবার কি মনে হয় না স্নিগ্ধ প্রেমের পরশ পাবার, সঙ্গীতের সুর-সরোবরে ডুব দেবার! তোমাদের কি ইচ্ছা হয় না কিছু সৃষ্টি করতে, একখানা বই লিখতে, দুস্তর পারাবারের জন্য

সেতু বাঁধতে, ইচ্ছা কি হয় না একটি ফুল তুলে সরলতা মাখানো নিষ্পাপ হৃদয়ের কাউকে উপহার দিতে?'

কিন্তু অপমানিত নারীর এ-প্রশ্নের জবাব দেয় না তারা। পুরানো কালের অত্যাচারীরাও দেয় নাই উত্তর…

ঘরের সেই দম-বন্ধ-নিস্তব্ধতায় আঘাত দিয়ে কে-একজন হঠাৎ শিষ দিয়ে ওঠে। সুরু হয় হৈ হল্লোড়, অট্টহাসি, অশ্লীল ফাজ্‌লামো, চিৎকার। একজন গা-ই চেঁচিয়ে ওঠে:

'সুরু কর, সুরু কর নিলাম। এই কোরিয় মেয়েটির জন্য এক ডলার…। নাও, নাও, আর দেরী নয়, ছুঁড়ে দাও দেখি মেয়েটিকে আমার কোলে।'

'নিলাম, নিলাম, এক ডলার…চললো এক ডলারে একটি মেয়ে।'

'দুই ডলার…'

'তিন ডলার পঞ্চাশ সেণ্ট…'

চললো নিলাম। কুড়ি ডলারের উপরে কেউ আর ডাকতে পারে না। টাকা যদি না থাকে তো, দামের ডাক চলতে থাকে টাই-পিন দিয়ে, হাত-ঘড়ি, ফাউণ্টেনপেন দিয়ে—দাম হিসেবে সেগুলোও গ্রহনীয়। নিলামের হাতুড়ী পড়বার সঙ্গে সঙ্গে যে মেয়ে বিক্রী হয়ে যায়, তাকে তখন ছুঁড়ে দেওয়া হয় দর্শকদের মাঝে। দৌড়ে এসে ক্রেতা কেনা-মেয়েকে নিয়ে সুরু ক'রে দেয় নাচ, কিংবা টানতে টানতে নিয়ে যায় হলের ভিড়ের বাইরে।

প্যাণ্টের পকেটে গভীরভাবে হাত ঢুকিয়ে দেয় লিয়াম। জুন তাকিয়ে দেখে তার দিকে, বলে:

'একটু ধীরে বন্ধু, একটু ধীরে, অত গরম হয়ে উঠো না।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, সব থেকে যে মেয়েটা ভাল দেখতে, তাকে আমি নিলাম।'

'ও—, তবে হ্যাজেলের মত মেয়ে খুঁজছ, লিয়াম?'

'চপ্—' লিয়াম চেঁচিয়ে ওঠে : 'হ্যাজেল অ্যামেরিকান মেয়ে, আমার প্রেমিকা। ওর সম্বন্ধে মন্তব্য করতে হ'লে সাবধানে করবে।'

বেঁটেখাটো একজন গা-ই দাঁড়িয়েছিল পাশে। বলল :

'কোন তফাৎই তো দেখি না। ঐ হ্যাজেল, রোজ, র‍্যাসেল, ইসাবেলার মতনই তো এরা। অ্যামেরিকান মেয়েদের সঙ্গে তফাৎ কোথায়?'

ঘুষি বাগিয়ে ওঠে লিয়াম : 'সাবধান, এ-জাতীয় কথা বলতে পারবে না, বলছি।'

'ওঃ, আমার ভাল লাগছে না এসব। বড় পরিশ্রান্ত মনে হয়। লড়াই টড়াই আমি চাই না। আমি ঘরে ফিরে যেতে চাই।'

গরম হয়ে লিয়াম বলে ওঠে :

'ও, তোমার এসব পছন্দ হয় না! ঠিক বলছ? তবে যাওনা বাপু এখান থেকে বেরিয়ে। গির্জা ফির্জা খুঁজে নিয়ে উপাসনা করোগে, যাও! হ্যাঁ, আর কিছু ছাগ-দুগ্ধ পান ক'রো, বুঝলে, যত সব—'

হঠাৎ একটা চিৎকার ওঠে মঞ্চের দিকে। দাস বিক্রেতা মঞ্চের ওপরেই একটি বিবস্ত্র মেয়ের পিঠে সপাং ক'রে চাবুক কষিয়ে দিয়েছে। পিঠমোড়া ক'রে হাত বাঁধা মেয়েটি তখনও আপ্রাণ চেষ্টা করছে এই অপমানের বাধা দিতে, চিৎকার ক'রে উঠছে, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠছে। তাম্রবর্ণ মেয়েটির

ক্রোধদৃপ্ত মুখটি যেন প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা। কাঁধ বেয়ে এলিয়ে পড়েছে মাথার লম্বা চিকণ গভীর কৃষ্ণ কেশ। মনমাতানো সুন্দরী শয়তানী। মেয়েটির নগ্ন দেহে আর একটি চাবুকের বাড়ি পড়তে দেখেই লিয়মের মন অস্থির হয়ে ওঠে। সেই তাম্রবর্ণ সৌন্দর্য সে যেন গিলে গিলে খেতে থাকে। পরমুহূর্তেই চেঁচিয়ে ওঠে :

'মেয়েটির জন্য কুড়ি ডলার— !'

অনেকগুলো মুখ একসঙ্গে লিয়ামের দিকে ফেরে। গর্বোদ্ধত লিয়াম সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। হলের আর এক কোণ থেকে সার্জেন্ট কার্টন বলে :

'বিশ ডলার এবং আমার হাত-ঘড়ি !'

বেশ ধীর কণ্ঠে লিয়াম যোগ দেয় :

'বিশ ডলার, হাত-ঘড়ি এবং ফাউণ্টেন পেন !'

সমস্ত ঘরে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যায়। দুই ক্রেতার দিকে দর্শকমণ্ডলী উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দামের ডাক শোনে। ষাঁড়ের গোঁ-র ছাপ রয়েছে যেন কার্টনের চেহারায়। পেষা হিসেবেই সে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করেছিল। নির্দয়, মানব-দ্বেষী, দাম্ভিক গুণ্ডা প্রকৃতির লোকটা। ঘাড়ে-গর্দানে লোকটি ষাঁড়ের মত, মুষ্টিযোদ্ধার মাথার মত তার মাথা, আর মনে প্রাণে লোকটি কাপুরুষ। লিয়ামের ডাক শুনে কার্টন চেঁচিয়ে ওঠে :

'ঠিক হ্যায়, এই ধরলাম আমার চেনটিও।'

দাস-বিক্রেতা হাঁক দিয়ে চিৎকার করে :

এই যে বিকিয়ে গেল সস্তায় মেয়ে…কোন্নিয় সুন্দরী…গেল, গেল… বিশ ডলার—একটা হাত-ঘড়ি—একটা ফাউণ্টেন পেন—একটি সোনার চেন—গেল গো গেল, বিকিয়ে গেল, সস্তায় গেল ভাল মাল…'

'আচ্ছা, দাঁড়াও—' প্যাণ্টের বেল্ট খুলতে খুলতে চেঁচিয়ে ওঠে লিয়াম : 'এই নাও আমার চামড়ার বেল্ট। রূপোর বকলস লাগান বেল্ট। এর পরে শুধু থাকবে আমার ফৌজি কিট ব্যাগ। চাও তো এখুনি ছুঁড়ে দিচ্ছি।'

হো হো ক'রে হেসে ওঠে সকলে। হাসে সার্জেন্ট কার্টনও। মঞ্চ থেকে মেয়েটিকে ছুঁড়ে দিল লিয়ামের কাছে। চিৎকার ক'রে উঠে মেয়েটি লিয়ামের গালে মুখে বসিয়ে দেয় কিল ঘুষি থাপর খামচি। মেয়েটির আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য মেয়েটিকে ধরে বেশ কিছু উত্তমমধ্যম বসিয়ে দেয় লিয়াম।

হঠাৎ দরাজ কণ্ঠের শব্দ শুনে মুখ তুলে লিয়াম দেখে পশ্চিম দিক থেকে অনেক লম্বা নিগ্রো ছুটে এগিয়ে আসছে মঞ্চের দিকে। আজানুলম্বিত বাহু দুটি বিস্তৃত ক'রে দিয়ে, প্রশস্ত বক্ষ মেলে ধরে নিগ্রোটি দরাজ কণ্ঠে বলে :

'এসব বন্ধ করতে হবে। সহ্য করতে পারি না এসব। এ বন্ধ করতেই হবে।'

কতগুলি কণ্ঠ প্রায় একসঙ্গে ফেটে পড়ে :

'হটিয়ে দাও, হটিয়ে দাও ব্যাটা নোংরা নিগারটাকে।'

'না! আমি থামব না, আমাকে সরিয়ে দিতে পারবে না তোমরা।

আমার কথা তোমাদের শুনতেই হবে ভাই। এই নিলাম-ঘর বন্ধ করতেই হবে...'

'ব্যাটা নিগারটার হলো কি?' একজন জিজ্ঞাসা করে।

দীর্ঘ প্রশ্বাস টেনে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় নিগ্রো সৈনিকটি। কেমন যেন হঠাৎ সব কিছু গুলিয়ে যায় তার মাথায়। কিছুটা এগিয়ে এসে মঞ্চের ঘেরা-দড়ি ধরে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সে বলে:

'আমার মনের সব কথা হয়তো গুছিয়ে বলতে পারব না। তবুও আমি যা বলতে চাই তা হলো এই: আমাদের পুরানো কালের ইতিহাসে, অন্তর্বিপ্লবের সময়ে—এবং তারও পূর্বে—আমাদের দেশেও এই রকম মানুষ-নিলামের বাজার ছিল। প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে আমাদের তার জন্য। মহাত্মা এ্যাব্রাহাম লিন্‌কোন—'

'হতচ্ছাড়া ব্যাটা নোংরা নিগারটার মুখে যেন কমিউনিস্ট বুলি শুনছি। ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দাও ব্যাটাকে। নিগারটার মুখে কিছু ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ ক'রে দাও।'

'আমার কথা তোমাদের শুনতে হবে, ভাইসব! বিশ্বাস কর ভাইসব, আমি কমিউনিস্ট নই। লক্ষ লক্ষ আমেরিকানদের মত আমিও একজন সাধারণ আমেরিকান নাগরিক। নাম আমার স্মিথ, নিউ ইয়র্ক শহরের হার্লেম স্ট্রীটের জো স্মিথ। ঐ আমার ঠিকানা। আমার মা কাজ করেন এক ধোবীখানায়। আমার ছোট ভাই খবরের কাগজ বিক্রি করে। আমি যে মেয়েটিকে ভালবাসি, তার নাম জেন। সেও বাস করে হার্লেম স্ট্রীটে তার বাবা-মার সঙ্গে। আমার জেনের মতনই এই মেয়েরাও।

এঁদের সঙ্গে তোমরা তো এভাবে ব্যবহার করতে পার না, ভাই সব। তোমরা তো অতি সজ্জন ভদ্র—'

সার্জেন্ট কার্টন চেঁচিয়ে ওঠে: 'কমিউনিস্টদের ভাষা শুনছি যে নিগারটির মুখে!'

'না, না, আমি কমিউনিস্ট নই। কোন দিন আমি মার্ক্সের লেখা পড়ি নি। আমি পড়েছি আমাদের পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ। জীবনে বহুবার বুভুক্ষার মুখোমুখী দাঁড়াতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু, বিশ্বাস কর ভাই সব, কোনদিন আমি কমিউনিস্টদের হাতে হাত মিলাই নি। আজ আমি তোমাদের যে-কথা বলছি, সে-কথা আমি শুনেছি নিউইয়র্কেরই একজন শ্বেতাঙ্গ পাদ্রীর কাছে। তিনি আমাকে বলেছিলেন: বুঝলে স্মিথ, দুনিয়ার সৎ ব্যক্তিমাত্রই সম্মান করবে মেয়েদের। কারণ, মেয়েরা তো আমাদের মা, আমাদের মেয়ে, আমাদের স্ত্রী, আমাদের প্রিয়া। মেয়েদের সম্মান দেখিয়ে আমরা নিজেদেরই প্রতি আত্ম-সম্মান দেখাই। আর, তা ছাড়া, এঁরাই তো সৃষ্টির ধারয়িত্রী, সভ্যতার ধর্ত্রি…'

'এই নোংরা নিগার ব্যাটা নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট,' স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে উিলিয়াম বলে: 'কমিউনিস্ট না হ'লে এভাবে কেউ কথা বলতে পারে? ধাক্কা দিয়ে ব্যাটাকে নীচে নামিয়ে দাও। দেখে নিচ্ছি ব্যাটাকে একবার। আয়, নেমে আয় ব্যাটা, জীবনের প্রতি মায়া যদি থাকে তো নেমে আয় বলছি।'

'না! আমি আসব না। ভাইসব! আমি তোমাদের কাছে একটি কথা বলব। কিছু কিছু ইতিহাস পড়েছি আমি। আমি বুঝতে পারছি—আমার

দেশবাসী তোমরা,—আমি বুঝতে পারছি, কি সমূহ বিপদের পথে আমরা ছুটে চলেছি। প্রায় দুশো বছর পূর্বে তোমাদের পূর্বপুরুষরা জাহাজ ভিড়িয়েছিল আফ্রিকার উপকূলে। আমার পূর্বপুরুষদের সেই আফ্রিকা… গভীর অরণ্য, হরিৎ বর্ণ টিয়েপাখী, নীল হ্রদ আর জিরাফের গায়ের চকমকে রং…। তারা নামল আফ্রিকার মাটিতে আর খেদায় হাতী ধরার মত ক'রে ধরতে লাগল আফ্রিকার সরল বাসিন্দাদের। তারপর সেই কৃষ্ণকায় লোকদের ধাওয়া ক'রে নিয়ে গেল…জাহাজের খোলে বন্দি ক'রে নিয়ে গেল তাদের ভীন দেশের নিলামের বাজারে। স্ত্রী পুরুষ শিশু—হাজারে হাজারে বিক্রী হলো, ক্রীতদাস হলো। সেই সাবেক কালের দাস বিক্রেতার মত আজও এখানে সেই দর্শক মণ্ডলী, সেই চাবুক…! ভাইসব! সে-চাবুকের দাগ কেটে বসে আছে আমার হৃদয়ে। সেই ব্যথায়ই আজ তোমাদের সামনে দাঁড়িয়েছি এত কথা বলতে। আমি তো জানি, বন্ধু, এই পাপের জন্ত কত কালো শোণিত ধারার দুস্তর পারাবার সৃষ্টি হয়েছিল উত্তর ও দক্ষিণী রাষ্ট্রের মধ্যে। আবার নতুন ক'রে সেই পাপের সমুদ্র সৃষ্টি কেন? আমি বলছি, এই নিলাম বেশী দিন চলতে পারে না… সেই সাবেক কালের মতই বন্ধ হয়ে যাবে। দাস-বিক্রেতাদের দুঃখ পেতে হবে। দক্ষিণী রাষ্ট্রের দাস বিক্রেতারা, রোম, দামাস্কাস, গ্রীস, কার্থেজ, এমন কি সেদিনের বার্লিনের দাস-বিক্রেতাদেরও এই দুর্ভোগ অবস্থা হয়েছে। এখনকার মতই তাদের কালেও তারা গগনভেদী গর্ব-উদ্ধত্যে আকাশ মেদিনী কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ফল পেয়েছে তারা!…তোমাদের আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি, বন্ধু…দেখ, তাকিয়ে দেখ, সমগ্র এশিয়ার

বুকে কি উত্থান সুরু হয়েছে। এশিয়ায় তোমরা ক্রীতদাসের নিলাম-বাজার আর খুলতে পারবে না…'

·· সট্‌, সট্‌ শব্দে হঠাৎ তিনটি গুলি ছুটে গেল…

জো স্মিথ নিগ্রোর প্রশস্ত বুক ভেদ ক'রে সে-গুলি গেল ছুটে। বিশাল বৃক্ষের মত লম্বা দেহটি মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল। বাহু দুটো মঞ্চের দড়ি আঁকড়ে ধরল। মাথাটি ঝাঁকানি খেয়ে একধারে ঈষৎ নুয়ে পড়ল—দু হাজার বছর পূর্বে যিশু খৃষ্টের মাথা যে ভাবে হেলে পড়েছিল সেই ভাবে। দড়িটি ভারে ছিঁড়ে গেল, নিগ্রো সৈনিকের দেহটি মঞ্চ থেকে নীচে পড়ে গেল। মঞ্চের ওপর রক্তের লাল দাগ পড়ল, পড়ল হল ঘরের মেঝের ওপর। অন্যান্য গা-ই-রা মৃতদেহটিকে টানতে টানতে হল ঘরের বাইরে ফেলে দিয়ে এল। সুরু হল আবার নিলাম।

এক ডলারে একটি মেয়ে। একটি হাতঘড়িতে একটি মেয়ে, একটি ফাউণ্টেন পেন—একটি মেয়ে। একটি আংটি—একটি মেয়ে…চলল নিলামের ডাক। পণ্য বিক্রী হতে থাকে, মঞ্চ খালি হয়। মঞ্চের পিছনে টাঙানো রয়েছে আমেরিকার সুবৃহৎ একটি জাতীয় পতাকা—তারকা খচিত ডোরাকাটা…হাঁ, ডোরাকাটা!

নিলামের উত্তেজনা কমে এলে, পাশের একটি ঘরে লিয়াম, জুস ও কার্টন সুরু করে তাস খেলা। তাদের কোলে বসিয়ে রাখে নগ্ন দেহা তিনটি মেয়েকে। শান্তভাবে তারা বসে থাকে, এমন কি লিয়ামের কেনা মেয়েটিও। কিছুক্ষণ খেলার পরে সার্জেণ্ট কার্টনের এই একঘেয়ে খেলা

আর ভাল লাগে না। তাস ফেলে দিয়ে সে বলে : 'আর ভাল লাগছে না। এস নতুন কিছু খেলা যাক।'

'নতুন খেলা? কি খেলা?' জিজ্ঞাসা করে জুস।

'এ-খেলায় গোলামের তাস বিবির থেকে বড়।'

'সে কি? বিবি থেকে গোলাম তো সব সময়েই ছোট।'

'না, এই নতুন খেলায় না। এ-খেলায় গোলামই বড়। ভারী মজার খেলা।' বলে কার্টন।

'কোথায় শিখেছিলে এ-খেলা?' লিয়াম জিজ্ঞাসা করে।

'গত যুদ্ধে শিখেছিলাম একজন নাৎসি বন্দীর কাছে।'

'আচ্ছা, এস, খেলা যাক।' লিয়াম বলে।

'কিন্তু চারজন লাগবে যে। আমরা তো আছি তিন জন।'

'আমরা আছি ছয় জন,' মন্তব্য করে জুস : 'কিন্তু এই কোরিয় মেয়েরা তো একেবারে ভেড়াকান্ত, আমাদের খেলা তো বোঝে না।'

সার্জেন্ট কার্টন চতুর্থ ব্যক্তির খোঁজে চারদিকে দেখে। একজন গা-ই একটি কোরিয় মেয়েকে নিয়ে আসছে। কিন্তু মেয়েটি তো উলঙ্গ নয়। গা-ই-র লম্বা কোটটি মেয়েটির গায়ে চাপিয়ে দেওয়া আছে। সার্জেন্ট কার্টন হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ে। চিৎকার ক'রে বলে :

'কি ব্যাপার হে?'

'ও লম্বা কোটটি আমারই—'

'খুলে নাও, বিবস্ত্র ক'রে দাও মেয়েটিকে।' হুকুম দেয় সার্জেন্ট কার্টন।

দুর্বল কণ্ঠে সৈনিক প্রতিবাদ করে : 'ভারী খারাপ লাগে—'

'কোট খুলে নাও, খুলে নাও—' অফিসরের স্বর সার্জেন্টের কণ্ঠে।

সৈনিক দু'পা একজায়গায় ঠুকে অভিবাদন জানিয়ে হুকুম পালন করে। মেয়েটির গা থেকে লম্বা কোটটি খুলে নেয়।

'এবার এস দেখি, একজন ভদ্র মার্কিনের মত একটু তাস খেলা যাক।'

নবাগত সৈনিক বসল তাসের আড্ডায়। নিজের নামও সে বলল, সিম্পসন।

'সেই স্বনামধন্য সিম্পসনের সঙ্গে কি কোন আত্মীয়তা আছে তোমার?'

'হাঁ, আছে!' উত্তর দেয় নবাগত সৈনিক।

'কি রকম সম্পর্ক?'

'ও—, খুবই সাধারণ সম্পর্ক, এই প্রভু-গোলামের সম্পর্ক আর কি। তারা হলেন আমার মালিক, আমি তাদের গোলাম, মজুর। দুনিয়া ব্যাপী তো আমরা ছোট সিম্পসনরা বড় সিম্পসনদের গোলাম।'

'দেখ ছোকরা, ঐসব লাল কথাবার্তা এখানে বলতে পারবে না। আর যেন না শুনি, সাবধান। যদি বল তো ঐ কমিউনিস্ট নোংরা নিগারটার মত অবস্থা ক'রে দেব। এবারে এস তাস-খেলায়। আমি হলুম গোলাম, আর আমার কোলের এই মেয়েটি হল রুহিতনের বিবি। লিয়াম হল হরতনের গোলাম, ওর কোলের মেয়েটি হরতনের বিবি। জুসের মেয়েটি হলো ইস্কাপনের বিবি, আর সে তার গোলাম। সুতরাং তোমার আর পছন্দ ক'রে নেওয়ার কিছু রইল না।'

'তা বটে', বলে সিম্পসন : 'গোলাম তো গোলামই—'

বিবি

'এবার তাস ভাঁজতে সুরু কর।' হুকুম দেয় সার্জেন্ট কার্টন।

ভেঁজে নিয়ে, কেটে, তাস চেলে দেওয়া হল। সিম্পসনের ভাগ্য ভাল, সে প্রথমেই দেখিয়ে দিল হরতনের গোলাম। সুতরাং লিয়ামের কোলের মেয়ে চালিত হলো সিম্পসনের কোলে। তার কোলে দুটি মেয়ে। খেলা চলতে থাকে। কোন সময়ে সার্জেন্টের কোলে দুটি মেয়ে। জুস একবার পেয়ে বসল তিনটি মেয়ে। খেলা চলল বহুক্ষন। কিন্তু আশ্চর্য, সার্জেন্ট কার্টন একবারও তার কোলে বসাতে পারল না হরতনের বিবিকে। ঠাট্টা বিদ্রূপ চলে তাকে নিয়ে। সার্জেন্ট মনে মনে ক্রমশ ক্ষেপে ওঠে। বাইরে অদ্ভুত নিথর নিস্তব্ধতা। হঠাৎ মাঝে মাঝে দু'একবার মেসিন গানের গুলির শব্দ আসে, তার পরমুহূর্তেই আবার সেই মৃত্যু-নিস্তব্ধতা। সিওল দখল করেছে বিদেশীরা, কিন্তু প্রতিরোধ সংগ্রাম চলছে এখনও। গৃহাভ্যন্তরে তাস খেলা চলেছে। কিন্তু কার্টন একবারও হরতনের গোলাম পেল না। কেন? ব্যাপার কি? অন্ততঃ একবারের জন্যও তাকে হবতনের গোলামের তাস পেতেই হবে।

বাইরে বিরাট বিস্ফোরণের শব্দে ঘরের মার্কিন সৈন্তরা ছুটে দেখতে যায়। শুধু চুপচাপ বসে থাকে নগ্নদেহা কোরিয় নারীরা। দূরের একটা সুবৃহৎ অট্টালিকার উপরে এরোপ্লেন থেকে বোমা পড়েছে। গত সাত দিন ধরে কোরিয় সৈন্যরা এই অট্টালিকা থেকে মার্কিনদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাচ্ছে। ভূমিসাৎ হয়ে গেছে বাড়ীটা, চারধারের প্রায় শ' খানেক গজ জায়গা নিয়ে সব কিছু ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। অত্যন্ত

সুনিপুণ ভাবে কাজটি হয়েছে দেখে মনে মনে তারিফ করতে করতে ফিরে আসে লিয়াম তাসের টেবিলে।

ফিরে এসেই তার প্রথম দৃষ্টি পড়ে তার কেনা তাম্রবর্ণা মেয়েটির ওপরে। দেখে মেয়েটি তাকিয়ে আছে তার দিকে। অদ্ভুত…মুহূর্তের জন্য মেয়েটির চোখ যেন জ্বলে ওঠে। তারপরই সে তার মাথা নামিয়ে নিয়ে লিয়ামের কোলে বসে থাকে। একটু সন্দেহের রেখাপাত হয় লিয়ামের মনে। কিন্তু কিছুই তো হল না, মেয়েরা চুপচাপ বসে আছে তাদের কোলে। সুতরাং সন্দেহ মুছে ফেলে আবার খেলা সুরু করে তারা। রাত্রি গড়িয়ে চলল গভীর নিশীথিনীর কোলে। হঠাৎ সিম্পসন বলে ওঠে:

'নাও, এবার বন্ধ কর। আর নয়। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি।'

'আচ্ছা, আর এক হাত হোক।' অনুরোধ করে কার্টন। তার স্বরাতুর দৃষ্টি দিয়ে হরতনের বিবিকে গিলে খেতে চাইছে।

'শেষ খেলা তো!' প্রশ্ন করে লিয়াম।

'হাঁ, এই বারই শেষ!' কার্টন বলে।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সিম্পসন তাকিয়ে দেখে একবার লিয়ামের দিকে, আর একবার কার্টনের দিকে। বলে: 'হাঁ, এইবার খেলেই আর খেলব না।'

'আচ্ছা আমি এবারে তাস ভাঁজব।'

'কেন? এবারে আমার পালা।' লিয়াম বলে।

'না, এবারে আমাকে ভাঁজতে দাও ভাই।'

'আচ্ছা।'

সিম্পসন তাস ভাঁজে। লিয়াম বলে ওঠে:

'আবার ভাঁজ।'

সিম্পসন আবার ভাঁজে।

কার্টন বলে : 'আমি কাটব।'

'আচ্ছা, কাট।' লিয়াম বলে।

তাস কেটে একখানা কার্ড তুলে নেয় কার্টন। ধীরে ধীরে তাসটি সকলের সামনে মেলে ধরে সে। হরতনের বিবি।

বহুক্ষণ ধরে গভীর নীরবতা বিরাজ করে কক্ষটিতে। ধীরে ধীরে লিয়াম সোজা দাঁড়িয়ে ওঠে প্যাণ্ট ঠিক করতে করতে বলে ওঠে :

'এর মধ্যে চালাকি আছে।'

'মানে?' কার্টন চ্যালেঞ্জ করে।

'কারণ আমার হাতেও যে একখানা হরতনের বিবি আছে।' তাসটি দেখিয়ে সে বলে : 'তাস ভাঁজবার আগেই আমি এই তাসটি তুলে নিয়েছিলাম।'

'আমি কিন্তু ঠিকই ধরেছিলাম,' সিম্পসন বলে : 'সেই জন্যেই আমি হাত-সাফাই করেছিলাম। যুদ্ধে আসবার আগে দেশে আমার জীবিকাই ছিল এই হাত-সাফাইয়ের উপরে—'

হঠাৎ একজন গা-ই দৌড়ে এসে বলে : 'পালাও, পালাও, জীবন নিয়ে পালাও। কোরিয়রা এ-বাড়ীতে ঢুকে পড়ছে!'

তাড়াতাড়ি উঠে তারা পালাতে সুরু করে। পড়ে থাকে তাদের তাস, মদের বোতল, কেনা মেয়ে মানুষ।…

কিন্তু তাদের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। কঠিন চিকণ কণ্ঠে হুকুম আসে :

'থামো।' পিস্তলের মুখের সামনে তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই তাম্রবর্ণা মুক্তকেশী নগ্নদেহা কোরিয় নারী পিস্তল তুলে দাঁড়িয়ে আছে পথ আগলে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে সে বলে: 'তোমরা তোমাদের খেলার মধ্যেও লাল কাউকে চাও না। কিন্তু তোমরা ভুলে গেছ যে হরতনের বিবির রং সব সময়েই লাল, এমন কি তোমাদের আমেরিকায় তৈরী তাসেও।'

পিস্তলের মুখ তুলে সে গুলি করে লিয়ামকে, তারপর কার্টনকে। সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে জুস গুলি ছোঁড়ে তাম্রবর্ণার দিকে। বাইরেও গুলির শব্দ। হৈ হৈ···দৌড়···গোলমাল···পলায়ন···আরও গুলির শব্দ···তারপরে আবার নিস্তব্ধতা···

গেরিলারা ফিরে এসেছে। অট্টালিকার স্থানে স্থানে মেসিন গান বসিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসল তারা। লিয়াম, জুস, কার্টন সিম্পসন ও অন্যান্য মার্কিন সৈন্যের মৃতদেহ তারা সরিয়ে দিল। তুলে সরিয়ে নিল তিনজন মৃতা কোরিয় যুবতীর দেহও। মার্কিন সৈন্যদের গুলিতে তাদের প্রাণ গেছে। আহতাবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকে তাম্রবর্ণা কোরিয় রমণী।

একজন কোরিয় যুবক গেরিলা সৈনিক মাথা অবনত ক'রে দেখে তাকে। হঠাৎ চিনতে পেরে সোজা ঝুঁকে পড়ে বলে: 'মিং মিন্‌স! চোখ খোল, দেখ, কে এসেছে, এই যে আমি হাক্‌-কু!'

ধীরে চোখ খোলে মিং। আনন্দ-বেদনাশ্রু ঝরে পড়ে তার চোখ দিয়ে, ঠোঁটে স্মিত হাসি। অতি কষ্টে ডান হাতটা একটু তুলে হাক্‌-কুর কাঁধে রেখে মিং প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলে:

'হাক্‌-কু, ক্ষমা কর আমাকে···গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিতে

বলেছিলে তুমি আমাকে···আমি রাজী হই নি। আমার দেশের বিপদের গভীরতা আমি বুঝতে পারি নি তখন হাক্-কু। কিন্তু আমি এখন বুঝেছি···আমাকে ক্ষমা কর হাক্-কু···' আস্তে আস্তে আবার চোখের পাতা বুঁজে আসে।

'কিন্তু এখানে তুমি কি ক'রে এলে মিং? আমি যে ঠিক বুঝতে পারছি না। সিওল থেকে তো তুমি অনেক দূরে ছিলে।'

অতি কষ্টে বেদনাহত মৃদু স্বরে মিং উত্তর দেয়:

'ধরে নিয়ে এসেছে আমায়···আরও চার শ'জন কোরিয় মেয়ের সঙ্গে—'

হাক্-কুর ঠোঁঠের ওপরে দাঁত চেপে বসে।

'আমাকে টেনে হেঁচড়ে বাড়ী থেকে বের ক'রে এনে এরা লরীতে চাপিয়ে নিয়ে এসেছে···কাপড় জামা খুলে নিয়ে উলঙ্গ ক'রে তুলে ধরেছে নিলাম ঘরে···আমাকে বিক্রী করেছে···আমাকে কিনে এনে তাদের জুয়ার বাজী—' কেঁদে ওঠে মিং: 'হাক্-কু, গরু-ভেড়ার মত আমাদের কেনা-বেচা করে? জুয়োর বাজি আমরা?

স্তব্ধ-বাক্ হাক্-কু···পাথরের মত কঠিন শীতল।

প্রিয় দেহের সংলগ্ন হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী মিংএর চোখে আনন্দের রেখা ফুটে ওঠে, ঠোঁটে দেখা দেয় ক্ষীণ হাসি। আরেকটি হাত হাক্-কুর গলায় রেখে বলে:

'কিন্তু, হাক্-কু, আমি আমার ঐ মার্কিন ক্রেতা-প্রভুকে খতম ক'রে দিয়েছি···তারই পিস্তল দিয়ে গুলি করেছি···কোলে বসিয়ে রেখেছিল,

সেই সময় ওর পিস্তল আস্তে আস্তে তুলে নিয়েছিলাম, টেরও পায় নি।' মিংএর ঠোঁটে হাসিটি আরও বেশী ফুটে ওঠে। আস্তে আস্তে হাক্-কুর প্রস্তর কঠিন মুখেও হাসি দেখা দেয়। দু' হাত বাড়িয়ে মিংএর ছোট্ট মাথাটি নিজের শক্ত হাতের তেলোতে তুলে ধরে ধীরে বলে :

'আমি জানতাম মিং, তুমি একদিন নিজেই বুঝতে পারবে, নিজেই এসে যোগ দেবে গেরিলা বাহিনীতে। সেদিন যদি যোগ দিতে মিং—' থেমে যায় হাক্-কু। তারপর আবার বলে : 'গভীর ট্রেঞ্চে, মাটির নীচে গর্তে, পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় বসে বসে তোমার কথা আমি ভেবেছি বারে বারে···রাগ করেছি তোমার ওপরে, জোর ক'রে তোমার চিন্তা মন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি···একটি দুর্বলা মেয়েকে ভালবাসি কি ক'রে!'

মিংএর মুখের সেই স্মিত হাসি মুছে গেছে মুহূর্তের মধ্যে। কালো ছায়ার ঘোমটা ঢেকে দিয়েছে তার মুখ। ভাঙ্গা কণ্ঠে মিং বলে : 'কিন্তু হাক্-কু, আজ আমায় রক্ষা কর। সে-ভুলের দাম তো দিলাম আমি জীবন দিয়ে।'

আরও কিছু বলতে চেয়েছিল মিং। কিন্তু পারল না, মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে তার কথা আটকে দিল। ঝুইয়ে পড়ে হাক্-কু সে-রক্ত মুছে দিল। আরও রক্ত গড়িয়ে পড়ল, হাক্-কু আবার মুখ মুছে দিল। একটু নীরব থেকে সামলে নিয়ে অতি ধীর কণ্ঠে মিং আবার বলল : 'সেই দিনের কথা মনে পড়ে কি হাক্-কু, যেদিন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। আমাদের গাঁয়ে সেই পপলার গাছের নীচে···তোমার

হাতে ছিল একখানা কাগজ···তুমি আমার সামনে মেলে দিয়ে বলেছিলে সই দিতে···'

'হাঁ, শান্তির আবেদন পত্রে সই সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলাম। তখন কি জানতাম যে আমেরিকানরা এত শিগগির আমাদের দেশে ধ্বংস ও মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা স্থরু করবে?'

'সেদিনের কথা মনে আছে তোমার? বসন্ত কাল তখন, ফুলে ফলে সৌন্দর্যে গাছ ছিল সেদিন ভরা···'

হাক্-কুর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। আস্তে আস্তে প্রিয়ার মাথায় মৃদু আদর জানায় সে। বলে: 'তুমিও ফুল গুঁজেছিলে এইখানে!'

মিংএর চোখ বুঁজে আসে, অতি ধীর কণ্ঠে বলে: 'সেদিনের কথা মনে পড়ে হাক্-কু···সেই সপ্তমীর রাতে···নদীর তীরে···দূর থেকে ভেসে আসছিল বাঁশীর স্থর। গাছের নীচে আমরা বসে। তোমার চোখে মুখে কি যেন বলা না-বলার প্রশ্ন ছিল ঝুলে। হঠাৎ কাছে ভিতের কোন্ বাড়ীতে দুটি শিশুর হাসি কলধ্বনি ভেসে এল আমাদের কানে। তুমি যেন ভাষা পেলে মুখে···মনে পড়ে প্রিয় সে-রাতের কথা?'

'হ্যাঁ গো, সব মনে পড়ে। কিন্তু সেদিন তো মার্কিন দস্যু আমাদের মাঝে হামলা করেনি, আমাদের দেশ-গাঁ জালিয়ে দেয় নি—'

অতি কষ্টে মিং চোখ মেলে তাকায়। অদ্ভুত দৃষ্টি সে চোখে। গভীর নিশ্বাস ফেলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলে: 'সেদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম তোমাকে জান! দেখেছিলাম শান্তির নীড়ে বাসা বেঁধেছি আমি তুমি··· ছোট্ট গেহ···মেঝের ওপরে হামা দিয়ে খেলছে আমাদের ছোট্ট শিশু···

দেয়ালের গায়ে বুদ্ধর ছোট্ট ধ্যানগম্ভীর মূর্তি···আমাদের গৃহের সামনের বাগান ফুলে ফুলে হেসে উঠেছে। আমি রেঁধেছি সুগন্ধ চালের ভাত, আকাশ-বাতাস মাতিয়ে দিয়েছে সে সুগন্ধ···

সব সুখ-স্মৃতি মনে পড়ে হাক্‌-কুর। মুহূর্তে সমস্ত তমিস্রা ভেদ ক'রে সমগ্র যৌবন প্রদীপ-শিখার মত পূর্ণ গৌরবে জল জল ক'রে জলে ওঠে মনের পটে। পরমূহূর্তেই সে-প্রদীপ যায় নিভে···আবার সেই কালো হিম শীতল ঘনান্ধকার। যেন অনুভব করে সেই হিমেল শীতলতা মিংএর হাত বেয়ে উঠে আসছে। মাথা ঝাঁকানি দিয়ে সম্বিত ফিরিয়ে এনে সে তাকায় মিংএর চোখে। পলকহীন চোখের স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিং তার দিকে, কিন্তু সে-দৃষ্টিতে শিহরণ-জাগানো আলো কৈ? এ-আঁখি চেয়েছিল প্রিয়র প্রেম, চেয়েছিল ছোট্ট গেহ, শিশু, ফুল, পৃথিবীর বুকে নব নব বসন্তের আগমন। হাক্‌-কুর দু চোখ বেয়ে জল নামে। শুকনো কড়া-হাত তুলে সে-অশ্রু মুছে ফেলে। তারপরে অতি ধীরে, মমতার সমস্ত পরশ দিয়ে আস্তে আস্তে প্রিয়ার আঁখির পলক নামিয়ে দেয়। গায়ের কোটটি খুলে মৃতার দেহ দেয় ঢেকে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে শেষ-দেখা। তারপরে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে সেনাপতিকে স্যালুট জানাবার কায়দায় স্যালুট জানিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

হিম-শীতল গভীর রাত্রি···আকাশের তারারাও যেন কাঁপছে শীতে। বাতাসেও মৃত্যু-নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে মেসিন গানের শব্দ···আবার নিস্তব্ধতা···তমিস্রা রজনী।

.. হাক্‌-কু ভাবে: আমায় ছেড়ে মিং চলে গেল···আমার দেশের

বিবি

ওপরে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে···দূরে ভীন দেশে কত সুখ-নীড়ে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে কত প্রিয় ভাষণ বলে মানুষ···তারা কি জানে যে এই মুহূর্তে রক্ত ঢেলে ঢেলে কোরিয়া শান্তি-আবেদনে সই করছে? তার মনের এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে হাক্-কু। হঠাৎ কোন্ গেরিলার কোটর থেকে মেসিন গানের কাটা কাটা শব্দ স্তব্ধ তমিস্রা রজনীর বাতাস চিরে ছুটে চলে যায়। হাক্-কুর কঠিন মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে ওঠে। মেসিন গান নিয়ে অন্ধকার ঝোপে বসে মনি মাণিক্যের মত মেসিন গানের গুলি গুণতে গুণতে ভাবে: 'গরু ভেড়া মনে করেছে আমাদের, মনে করেছে খেলার তাস! কোরিয়ার দেশভক্ত সন্তান আমরা···মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কখ্খনও পারবে না আমাদের মাতৃভূমি দখল করতে।'